অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থায়ন

পিকেএসএফ দিবস ২০২৪

স্মারকগ্রন্থ

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থায়ন

পিকেএসএফ দিবস ২০২৪

স্মারকগ্রন্থ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
pksf.org.bd

পিকেএসএফ দিবস ২০২৪
স্মারকগ্রন্থ

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০২৪

উপদেশক
মোঃ ফজলুল কাদের
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদনা পর্ষদ
সুহাস শংকর চৌধুরী
মোঃ নেয়ামুল হাসান শোভন
সাবরীনা সুলতানা
শারমিন মৃধা
অনন্যা সান্যাল
ইরতেজা আহমেদ শাকরান
আলাল আহমেদ
মোঃ গোলাম এহছানুল হাবিব
শেহরীণ সাবা

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৬-০৫৫৭-৩

প্রচ্ছদ: সব্যসাচী হাজরা

অলঙ্করণ: শ্যামল চন্দ্র শীল

মুদ্রণ: জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস

[প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহে উল্লিখিত তথ্য ও মতামত লেখকের নিজস্ব, যা পিকেএসএফ-এর মতামতের প্রতিফলন নয়]

সূচি

বাণী ০৭
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী ০৮
মাননীয় অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী ০৯
প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

বাণী ১০
চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

মুখবন্ধ ১১
ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

আগামীর বাংলাদেশ গঠনে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা ১৩
আজহারুল ইসলাম

পিকেএসএফ একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান ১৫
ড. শরীফা বেগম

নিরাপদ খাদ্য ও পিকেএসএফ ১৭
মাহমুদা বেগম

একটি প্রতিষ্ঠানেই সমগ্র কর্মজীবন ২০
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পিকেএসএফ ২৩
ড. মোঃ আবদুল মুঈদ

পিকেএসএফ: সারাদেশে ছড়িয়ে দেয় নিশাবসানের গান ২৫
শফি আহমেদ

আলোর মিছিলে অভিযাত্রা: পিকেএসএফ-এর সাথে তিন দশক ২৯
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

পিকেএসএফ-এর সাফল্যের গর্বিত অংশীদার শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন ৩২
নাছিমা বেগম

দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ ও টিএমএসএস ৩৪
অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম

পরিবর্তনের আহ্বান: কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ৩৭
হুমায়রা ইসলাম, পিএইচডি

পিকেএসএফ-এর কাছে চিরকৃতজ্ঞ সোপিরেট ৩৯
অধ্যাপক ড. এম. মোসলেহ্ উদ্দীন

দরিদ্রদের সমন্বিত উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর অবদান অসামান্য ৪১
খুরশীদ আলম, পিএইচডি

পিকেএসএফ-এর সাথে স্মৃতিময় পথচলার ২৭ বছর ৪৩
জহিরুল আলম

কুড়িগ্রামের দারিদ্র্য বিমোচনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা ৪৫
বীর মুক্তিযোদ্ধা এস. এম. হারুন অর রশীদ লাল

উন্নয়নের সারথি পিকেএসএফ ৪৭
এএইচএম নোমান

সরকারি সহায়তায় দারিদ্র্য বিমোচন এবং পিকেএসএফ-এর আগামীর পথচলা ৪৮
ড. একেএম নুরুজ্জামান

পিকেএসএফ: টেকসই উন্নয়নের দিশারি ৫০
আবুল কালাম আজাদ

পিকেএসএফ-এ যোগদান: জীবনের নতুন অধ্যায় ৫২
মোঃ রায়হান মোস্তাক

স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, টেকসই উন্নয়ন এবং পিকেএসএফ ৫৩
ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম

প্রতিবন্ধীবান্ধব ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ এবং আমার অভিজ্ঞতা ৫৫
মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

প্রাণের পিকেএসএফ-এ অর্ধ যুগ ৫৭
মেহেদী হাসান ওসমান

প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের অংশীজন ৫৮
মোঃ শামসুজ্জোহা

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তৈরিতে পিকেএসএফ-এর অবদান অনন্য, অমূল্য ৬০
এডভিন বরুণ ব্যানার্জী

পিকেএসএফ: উন্নয়নের সূতিকাগৃহ ৬২
এস. এম. মোস্তাফিজুর রহমান

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর সাথে দিশা ৬৪
মোঃ রবিউল ইসলাম

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় তিন দশকের উন্নয়ন যাত্রা ৬৬
মোঃ আবু জাফর

সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন ৬৮
রফিক আহামদ

নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথপ্রদর্শক ৭০
তপন কুমার কর্মকার

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা অনন্য ৭২
এম.এ. রশিদ

পিকেএসএফ: সংগ্রাম-এর আলোকবর্তিকা ৭৪
চৌধুরী মুনীর হোসেন

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় নাটোরে ভেষজ পণ্য উৎপাদনে সাফল্যের গল্প ৭৬
এএফএম আখতার উদ্দিন

পিকেএসএফ: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দিন বদলের সহযাত্রী ৭৮
অসীম কুমার দত্ত

উন্নয়ন ভাবনা: পিকেএসএফ ও এমএসএস ৭৯
মোঃ আখতারুজ্জামান

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে পিকেএসএফ ও ইপসা'র অনন্য অর্জন ৮১
মোঃ আরিফুর রহমান

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আম্বালা ফাউন্ডেশন ৮৩
আরিফ সিকদার

উপকূলের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ-এর দৃপ্ত পদচারণা ৮৫
জাকির হোসেন মুহিন

অর্থনৈতিক মুক্তি ও মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে চাই সমন্বিত উন্নয়ন ৮৭
মোঃ মাহবুব-উল আলম

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় আমরাও অংশীদার ৮৯
খোন্দকার খালেদ হাসান

উপকূলের মানুষের উন্নয়ন সারথি ৯১
মোঃ লুৎফর রহমান

এসো'র অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ ৯৩
মতিনুর রহমান

আঠারো বছরের অবিচল সহযোগিতা ৯৫
মোঃ আসাদুজ্জামান

দুঃসময়ের পরম বন্ধু পিকেএসএফ ৯৬
শেখ ইমান আলী

ঘাসফুল-এর উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ ৯৭
আফতাবুর রহমান জাফরী

পিকেএসএফ-এর সাথে পথচলার ৩১ বছর ৯৯
মোঃ সাইফুল ইসলাম

পিকেএসএফ-এর গৌরবময় যাত্রায় 'বাস্তব' ১০০
রুহি দাস

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় নবলোক-এর অগ্রযাত্রা ১০২
কাজী রাজীব ইকবাল

টেকসই উন্নয়নের বৈশ্বিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের আঞ্চলিক প্রচেষ্টা ১০৫
সামছুল হক

কর্মসৃজনে দারিদ্র্য বিমোচন: পিকেএসএফ ও স্যাপ-এর যৌথ যাত্রা ১০৭
মোঃ দেলোয়ার হোসেন

বাধা আসবে, তবু যেতে হবে বহুদূর ১০৯
মোঃ কামাল উদ্দিন

প্রবীণদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি এবং কর্মময় বার্ধক্যের সম্পর্ক ১১১
আবুল হাসিব খান

পিকেএসএফ: টেকসই উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের সারথি ১১৩
এম. রেজাউল করিম চৌধুরী

জেলেপাড়ার গলি থেকে ফোর্বস ম্যাগাজিনের পাতায় ১১৫
মোঃ আজাদুল কবির আরজু

একটি প্রশ্নের উত্তরে মানব সেবার ব্রত গ্রহণ ১১৭
মোঃ শহীদুল হক

স্মৃতির পাতা থেকে ১১৯

পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩১

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ কার্তিক ১৪৩১
১৩ নভেম্বর ২০২৪

বাণী

'পিকেএসএফ দিবস-২০২৪' উদযাপন উপলক্ষে আমি পিকেএসএফ-এর সর্বস্তরের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী দেশের দুই কোটি পরিবারের সদস্যদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সম্পূর্ণ দেশজ ধারণার ওপর ভিত্তি করে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। আর্থিক সেবার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের অ-আর্থিক সেবাকেও আর্থিক সেবার সাথে সমন্বিত করেছে পিকেএসএফ। অব্যাহত অনুশীলনের মাধ্যমে আজ এটি দরিদ্রবান্ধব, টেকসই প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছে।

একটি উন্নত, বঞ্চনাহীন, কল্যাণমুখী পৃথিবী গড়তে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও কার্বন নিঃসরণ- এ তিনটি বিষয়ে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দিশারী হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। দেশের মানুষের টেকসই উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঝে সুষম, কার্যকর ও অভূতপূর্ব মেলবন্ধন সৃষ্টিতেও ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে পিকেএসএফ। আমি আনন্দিত যে, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমগুলো ১৭টি টেকসই উন্নয়নে অভীষ্টের ১২টির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

জনগণকে আর্থিক, কারিগরী ও প্রযুক্তি সহায়তার মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের উন্নতি করা সম্ভব, যা দেশের টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম প্রশংসনীয়। পাশাপাশি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে পিকেএসএফ সময়োপযোগী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফল হবে বলে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আশাবাদী।

আমি 'পিকেএসএফ দিবস-২০২৪' উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর একটি সুসংহত ও টেকসই আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বুনিয়াদ গঠনে আমার প্রায় এক দশকের নিবিড় সম্পৃক্ততা আমি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে স্মরণ করি।

যেকোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি একটি দীর্ঘমেয়াদি বিষয়। সুদৃঢ় মূল্যবোধভিত্তিক তাড়না থেকে সামাজিক চাহিদা টেকসইভাবে পূরণের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমেই এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি সুসংহত হতে থাকে। দেশের দারিদ্র্য নিরসনের জন্য অনেক দরিদ্র-বান্ধব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এ কাজটিই পিকেএসএফ করছে প্রশংসনীয়ভাবে। দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাদের কাজ ক্রমশই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার পেছনে দরিদ্র-বান্ধব, জামানতবিহীন ঋণ দানের পক্ষে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস যিনি এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং একগুচ্ছ দক্ষ, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গুণী ব্যক্তিদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের পরামর্শ পিকেএসএফ-কে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে বিশ্বের একটি প্রথম কাতারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

শুরুর দিকে পিকেএসএফ প্রাথমিকভাবে দু'টি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে-নিজেকে এবং সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা। পিকেএসএফ সামাজিক উদ্যোক্তাদের জন্য দরিদ্র-বান্ধব প্রতিষ্ঠান তৈরির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসহিতা অর্জন এবং সহযোগী সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের সদস্যদের সন্তোষজনকভাবে সেবা প্রদানের মাধ্যমে পিকেএসএফ একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট রেগুলিটরী অথরিটি (এমআরএ) এবং এর রেগ্যুলেশনস তৈরিতে পিকেএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রক্রিয়ার সাথে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরবর্তীতে এমআরএ'র চেয়ারম্যান হিসেবে আমার প্রত্যক্ষ সম্পৃক্তির বিষয়টি আমি আনন্দের সাথে স্মরণ করছি।

পরবর্তীকালে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে বৈচিত্র্যায়ন ঘটেছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কারিগরি, প্রযুক্তি, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, বাজার সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করছে পিকেএসএফ। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় পিকেএসএফ জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে কাজ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

একটি গতিশীল আর্থ-সামাজিক পরিবেশে পিকেএসএফ-কে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজের, সহযোগী সংস্থাদের ও তাদের উপকারভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগে প্রতিনিয়ত আসছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের এসকল প্রযুক্তি দক্ষতার সাথে ব্যবহারের মাধ্যমে কাজের জন্য আরও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আমি আশা করি এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পিকেএসএফ ব্রতী থাকবে।

পিকেএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। এ দিবস উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাদের সাফল্য কামনা করি।

(ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ)

প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ

বাণী

সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশকে দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন উন্নয়ন ধ্যান-ধারণার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। '৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষদের টেকসই আর্থিক পরিষেবা প্রদানের কাঠামো গঠনে একাধিক পরীক্ষামূলক প্রকল্পভিত্তিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। তন্মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প এবং পরবর্তীকালে, গ্রামীণ ব্যাংক-এর সাফল্য দরিদ্রবান্ধব আরও বিশেষায়িত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৈরিতে নীতি-নির্ধারকদের অনুপ্রাণিত করে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্পূর্ণ দেশজ ধারণার ওপর ভিত্তি করে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার সময় এর প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে আমি এর সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলাম। পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯০ সালে। প্রথম থেকেই পিকেএসএফ একটি সীমিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিবর্তে একটি প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির অব্যাহত কর্মসূচি বাস্তবায়নের কলা-কৌশল অবলম্বন করে। এ কৌশল লাগসই হয়েছে জেনে আমি গভীর আনন্দ অনুভব করি। আজ দেড় লক্ষাধিক এক বিরাট মাঠকর্মীবাহিনীর মাধ্যমে টেকসইভাবে আর্থিক সেবা প্রদানের সম্পূরক কর্মসূচি হিসেবে দেশের পিছিয়ে পড়া প্রায় দুই কোটি পরিবার উপকৃত হচ্ছে।

সঠিক নীতি ও কৌশল অবলম্বন এবং উপযুক্ত মানবসম্পদ নিয়োগের মাধ্যমে দেশব্যাপী এক সফল, দরিদ্রবান্ধব প্রতিষ্ঠান তৈরি করার উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে পিকেএসএফ। একইভাবে, দেশের সকল প্রতিষ্ঠান তাদের সেবাসমূহকে দরিদ্রবান্ধব করতে পারলে দেশের অনগ্রসর মানুষের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাতিঘরের মতো এক দিশারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজ ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল রাখবে বলে আমরা মনে করি।

পিকেএসএফ-এর এ সাফল্যের জন্যে আমরা এর অনুপ্রাণিত, দক্ষ কর্মীবাহিনী, এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ, এবং সর্বোপরি এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

পিকেএসএফ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি পিকেএসএফ-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

(বদিউর রহমান)

বাণী

পিকেএসএফ
চেয়ারম্যান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর কার্যক্রম সম্পর্কে আমি এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই অবহিত ছিলাম। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত সকলেই আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ। অর্থসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি পিকেএসএফ-কে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা প্রদানের সুযোগ পাই। প্রায় দুই দশক পূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের বিকাশে অবদান রাখতে পেরে আমি আজ গর্ববোধ করি।

আমি জানতাম পিকেএসএফ মূলত ক্ষুদ্রঋণের প্রসারে কাজ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আরও গভীরভাবে এর বহুমাত্রিক কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে অবহিত হলাম। এর মধ্যে রয়েছে মানবসক্ষমতা বৃদ্ধি, লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর, ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন, কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, কৈশোর কর্মসূচি, সুবিধাবঞ্চিত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় অভিযোজন কার্যক্রম ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর সাথে সংযুক্ত করে পিকেএসএফ এর বহুমাত্রিক কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। পিকেএসএফ-এর এ সকল কর্মকাণ্ডের সাফল্য সারাদেশে আরো কার্যকরভাবে প্রচারিত হওয়া দরকার যাতে এ সকল সু-উদাহরণের আরো বেশি ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

আমি মনে করি, পিকেএসএফ-এর সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে দরিদ্রবান্ধব প্রায় দুইশত টেকসই প্রতিষ্ঠান তৈরিতে বড় রকমের মৌলিক ভূমিকা রাখা। বর্তমানে এ সকল প্রতিষ্ঠান ১৮ হাজার শাখায় দেড় লক্ষাধিক কর্মীর মাধ্যমে দুই কোটি পরিবারকে আর্থিক এবং সম্পূরক অন্যান্য সেবা দিচ্ছে।

পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে কোনো প্রতিষ্ঠানের অতীতের সুকৃতির জন্য পরিতৃপ্ত হয়ে স্থবির হয়ে পড়ার অবকাশ নেই। আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় রেখে একটি যথাযথ কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে আমি পিকেএসএফ-কে পরামর্শ দিয়েছি। এর ফলে, পিকেএসএফ আগামীতে আরো কার্যকরভাবে এর প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পিকেএসএফ এ কাজেও অতীতের মতো এর সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

পিকেএসএফ-এর এযাবৎকালের সাফল্যের জন্য আমি এর দক্ষ ও অনুপ্রাণিত কর্মীবাহিনী, সহযোগী সংস্থা, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এবং সর্বোপরি, এর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী দেশের পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি ভবিষ্যতেও সংশ্লিষ্ট সকলের দৃঢ় সমর্থন প্রত্যাশা করি যাতে পিকেএসএফ দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষদের অগ্রসর হতে আরো বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

আমি পিকেএসএফ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। এ অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(জাকির আহমেদ খান)

পিকেএসএফ

ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মুখবন্ধ

প্রতিষ্ঠার পর পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ৩৪ বছর পূর্ণ করলো। একটি সংস্থার জন্য এটি খুব কম সময় নয়। কিন্তু দেশে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দরিদ্রবান্ধব টেকসই আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণের জন্যে এটি দীর্ঘ সময় নয়। এ সময়ে দরিদ্রবান্ধব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে পিকেএসএফ-এর জন্মলগ্ন থেকে অবলম্বিত কৌশল সফল হয়েছে বলা যায়। দেশের বর্তমান স্পন্দনময় ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর গঠনে পিকেএসএফ-এর সাফল্য আজ সুবিদিত।

শুরু থেকে পিকেএসএফ দেশের পিছিয়ে পড়া নাগরিকদের আত্মকর্মসংস্থানের প্রচেষ্টাকে অর্থায়নের মাধ্যমে প্রণোদনা জোগানোর লক্ষ্য স্থির করে। এজন্য পিকেএসএফ দেশে অনেক টেকসই ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গড়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয় এবং এর অর্থায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নির্বাচিত সামাজিক সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। শুরুতে এসকল বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলোর অর্থায়ন কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক রেগুলেটেড খাত হিসেবে বিবেচিত হতো না। পরবর্তীকালে, পিকেএসএফ-এর নেতৃত্বে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এ্যাক্ট ২০০৬ হবার পর ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর একটি আনুষ্ঠানিক আর্থিক খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা ছিল একটি বড় রকমের সাফল্য। এমআরএ গঠনের পূর্বে দেশের এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মানদণ্ড নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে পিকেএসএফ।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে উড্ডয়ন (take off) শুরু করে ১৯৯৬ সাল থেকে। ২০০৩ সালে প্রথমবারের মতো অর্থায়ন কার্যক্রমকে আরো কার্যকর করার জন্য অর্থায়নের সাথে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি সহায়তাকে সমন্বিত করে পিকেএসএফ বিশেষায়িত প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। এ ধারা অব্যাহত রেখে পরবর্তীকালে পিকেএসএফ-এর অব্যাহত অর্থায়ন কার্যক্রমকে মেরুদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে এর সাথে নানা বহুমাত্রিক কার্যক্রমকে সংযোজিত করেছে। সময়ের সাথে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক চাহিদা ও দারিদ্র্য সম্পর্কে পিকেএসএফ-এর ধারণার বিবর্তনের সাথে সাথে এ সংযোজনগুলো হয়েছে, যা তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে নানান ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হয়েছে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি আসার উজ্জ্বল সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিবর্তনের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে পিকেএসএফ আরো কার্যকরভাবে এর সেবাগুলো লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে পৌঁছে দিতে চায়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ইতোমধ্যে পিকেএসএফ কাজ শুরু করেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সদিচ্ছাকে পুঁজি করে সম্পূর্ণ দেশজ ধারণা নিয়ে আমরা যে টেকসই ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি, তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ পিকেএসএফ। এ সুউদাহরণ সকল পাবলিক সার্ভিস প্রদানরত সংস্থাগুলোর জন্য অনুপ্রেরণার স্থল হতে পারে।

পিকেএসএফ-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে এর সহযোগী সংস্থাগুলো। সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত সাফল্য হচ্ছে পিকেএসএফ-এর সাফল্য; আর এ সাফল্যের অংশীদার পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের অতীত ও বর্তমান সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, এর নিবেদিতপ্রাণ সকল কর্মকর্তা ও কর্মী, সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সর্বোপরি, তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকবৃন্দ যাঁরা পিকেএসএফ-এর কর্মসূচিসমূহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৩ই নভেম্বর ২০২৪-এ পিকেএসএফ দিবসে এঁদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আজ আনন্দের দিন; এ আনন্দ আমাদের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জসমূহ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে। ভবিষ্যতেও পিকেএসএফ সংশ্লিষ্ট সকলের অব্যাহত সমর্থন কামনা করে।

(মোঃ ফজলুল কাদের)

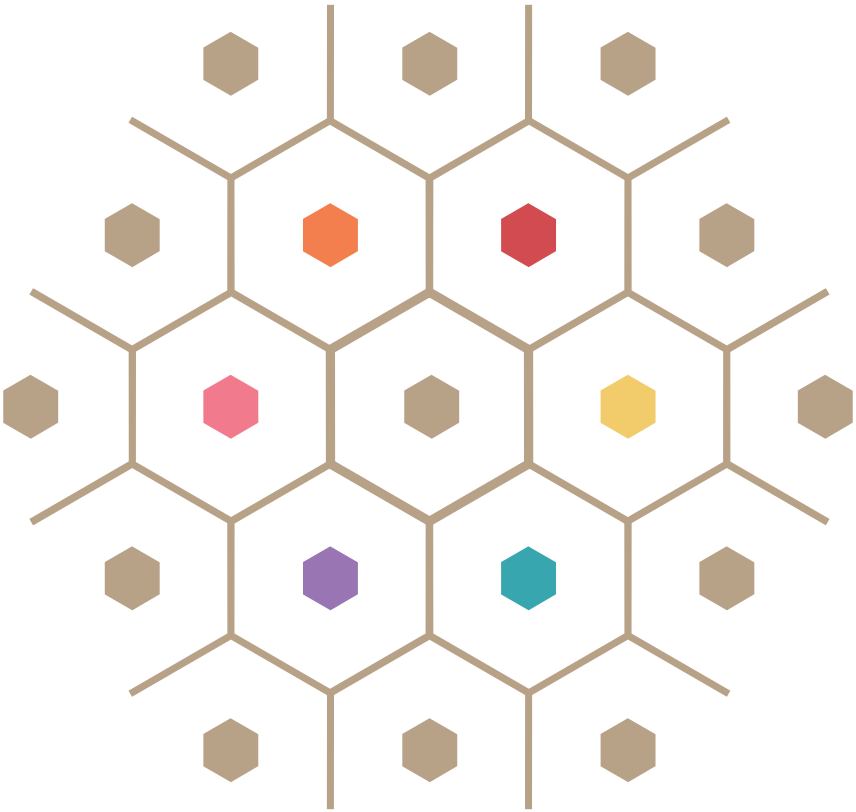

আগামীর বাংলাদেশ গঠনে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা

আজহারুল ইসলাম
সদস্য, সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ
ও বীজ বিশেষজ্ঞ

সরকারের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কর্মসৃজনের প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। 'লাভের জন্য নয়' কোম্পানি হিসেবে ১৯৯০ সাল থেকে পিকেএসএফ কাজ করে যাচ্ছে।

সময়ের বিবেচনায় ৩৪ বছর পেরিয়েছে। এ সময় ২৮৮ বেসরকারি সংস্থা পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে যুক্ত হয়েছে। লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ঋণ কর্মসূচি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়বর্ধক বিভিন্ন কার্যক্রমসহ বহুমাত্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে পিকেএসএফ। এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য হিসেবে বিধিবদ্ধ সভায় গিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন দেখেছি, ত্রৈমাসিক নিউজলেটারের মাধ্যমে যে তথ্য পেয়েছি তাতে উন্নতির বয়ান যথেষ্ট।

সরকারি চাকুরির শেষে পিকেএসএফ-এর মতো একটি দেশ-স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সুযোগকে সৌভাগ্য হিসেবে মানি। এর উত্তরোত্তর উন্নতিতে সম্পৃক্ত থাকতে পারা গৌরবের বিষয়। দেশের গ্রামগুলোর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি আগামীর বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে নয়টি বিভাগে ৬৪টি জেলা, ৪৯৫টি উপজেলা, ৪,৫৭৮টি ইউনিয়ন এবং ৮৭,০০০টি গ্রাম রয়েছে। এতোগুলো গ্রামের কয়টায় শহরের সুবিধাদি পৌঁছেছে? "কাজীর গরু কতোটা কেতাবে আছে, আর কতোটা গোয়ালে আছে" প্রবাদটির স্বরূপ উন্মোচন করে এগিয়ে যাবে পিকেএসএফ। আমরা সমসাময়িক ভাবনায় পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনীতি বিবেচনায় এবং লব্ধ অভিজ্ঞতায় গ্রামের আধুনিকতার কথা বলেছি। এ দু'টোর মিথস্ক্রিয়ায় পল্লীর কর্ম অথবা শহরের কর্ম কিংবা শহরে রূপান্তরিত পল্লীর কর্মসংস্থানে পিকেএসএফ কোন অবস্থানে আছে, কোথায় যেতে চায় এবং কোথায় যাবে - এর একটি আগাম ধারণাপত্র তৈরি হতে পারে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃষিবিদ হিসেবে পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের পাঁচটি সভায় মোটাদাগে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাগুলো রেখেছি:

১। লাভজনক কৃষির লক্ষ্যে সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থা;

২। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ও ব্যবহার বৃদ্ধি, যন্ত্রপাতি তৈরি, মেরামত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;

৩। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন;

৪। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট কৃষি প্রবর্তন, জৈব প্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার এবং এর প্রশিক্ষণ;

৫। পরিবর্তিত জলবায়ুতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উপযোগী ফসলের জাত, চাষ সম্প্রসারণ, সেচ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, এবং

৬। জাতীয় ফল কাঁঠালের খাদ্যমান, পুষ্টিমান বৃদ্ধিসহ শিল্পকার্যে ব্যবহার ও বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে টিস্যু কালচার, বায়ো টেকনোলজি, অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে এলাকাবদ্ধ চাষাবাদের বন্দোবস্ত করা।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। উপকূলীয় ১৯ জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার পাশাপাশি সম্ভাবনার দ্বারও খুলেছে।

সার্বিক বিবেচনা করে পিকেএসএফ আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালে সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ, ২০৭১ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ এবং ২১০০ সালে বদ্বীপ পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে সব সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে সুরক্ষিত বাংলাদেশ গড়ায় প্রিয় প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে, এই আমাদের প্রত্যাশা॥

পিকেএসএফ একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান

ড. শরীফা বেগম
সদস্য, সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ

দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের মহান ব্রত নিয়ে ১৯৯০ সালে প্রথাগত নিয়মের বাইরে পরিচালিতব্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সেই থেকে গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দরিদ্র পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মানব জীবনের বহুমাত্রিক উন্নয়ন সাধনের মহান প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি নিরন্তর কাজ করে চলেছে। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক সমস্যা বিবেচনায় দূরদর্শিতার সঙ্গে বহুবিধ কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করতে থাকে এবং এসবের সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠীর জীবনে শুধু যে দারিদ্র্য বিমোচনের আনন্দই বয়ে এনেছে তা নয়, তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে বৃহত্তর সমাজের অংশীদার হিসেবে পরিগণিত হতে সহায়তা করে চলেছে এবং সেই সাথে তাদের মানব মর্যাদা, মানবাধিকারও প্রতিষ্ঠা করে চলেছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ শুরুতে স্বচ্ছতার সঙ্গে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম শুরু করলেও ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সার্বিক চাহিদা পূরণ এবং কল্যাণ নিশ্চিতে অনেক অ-আর্থিক এবং বিশেষায়িত সেবা প্রদানেরও উদ্যোগ গ্রহণ করে, যেমন প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরি সহযোগিতা প্রদান, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পুষ্টি নিরাপত্তা ইত্যাদি এবং এসব কর্মসূচির আওতায় শিশু, কিশোর, যুব, নারী, প্রবীণ, তৃতীয় লিঙ্গ সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

সামগ্রিক উন্নয়নমূলক মানবকেন্দ্রিক 'সমৃদ্ধি' নামক একটি কর্মসূচির আওতায় মানুষের জীবনচক্রের সকল স্তরের অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বয়সের মানুষের জন্য বহুমাত্রিক মানবকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে পিকেএসএফ এর সফলতাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। অতিরিক্ত স্বস্তির জায়গা হলো পিকেএসএফ-এর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের উপকারভোগী কেবল সমতল ভূমির জনগণই নয়, বরং দেশের হাওর, চরাঞ্চল, দুর্গম পাহাড়ি জনপদ এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকার জনগণও। এক কথায়, পিকেএসএফ তার বহুবিস্তৃত এবং বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের সকল প্রান্তের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সব বয়সী, সব লিঙ্গের মানুষকে উপকৃত করে চলেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পিকেএসএফ ১৩টি অভীষ্ট অর্জনেও সরকারের অন্যতম সহযোগী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে, গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে মানব উন্নয়নে নিরন্তর সফল পথ চলায় পিকেএসএফ এখন একটি বড় প্রতিষ্ঠানই নয়, একটি দৃষ্টান্তমূলক সফল উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানও বটে।

পিকেএসএফ-এর এ যুগান্তকারী সফলতার পেছনে সরকারের যেমন প্রত্যক্ষ সহযোগিতা রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ইফাদ, জাইকা, ডিএফআইডি (বর্তমানে এফসিডিও), ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউএনডিপি'র মতো বহু প্রতিষ্ঠানের

অপরিসীম সহযোগিতা রয়েছে। পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নে এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক এবং অ-আর্থিক সহায়তা ব্যাপক প্রশংসার দাবি রাখে। পিকেএসএফ-এর সফলতার সঙ্গী আছে দুই শতাধিক সহযোগী সংস্থা (এনজিও) যারা মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে প্রতিষ্ঠানের বড় সম্পদ হলো সংস্থায় কর্মরত দক্ষ, যোগ্য জনবল এবং প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায্যতা। পিকেএসএফ-এর অসাধারণ সাফল্যের পেছনে আরো রয়েছে শুরু থেকে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান এবং এমডি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত দেশের প্রথিতযশা সম্মানিত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গের অপরিসীম অবদান। তাদের সুদূরপ্রসারী চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান ও দূরদর্শিতা সমাজ ও মানব কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ প্রতিষ্ঠানটিকে একটি অনন্য উচ্চতা অর্জনে বিশাল ভূমিকা রেখেছে।

পেশাগত জীবনে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কাজ করার সুবাদে দেশে বিদ্যমান দরিদ্র জনগণ, দারিদ্র্য, দারিদ্র্য নিরসনের উপায় ইত্যাদি নানা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। তবে ২০১৯ সালে পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদে যোগদানের পর এসব বিষয়ে আরো প্রত্যক্ষ এবং গভীর জ্ঞান লাভের সুযোগ পেয়েছি। বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের যে চ্যালেঞ্জ এবং সফলতার যে বহুমাত্রিক সুফল, তা খুব কাছ থেকে বোঝার, জানার, উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি। এ সুযোগ দেওয়ার জন্য পিকেএসএফ-কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই সাবেক চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে যার সময়ে পিকেএসএফ-এর পর্ষদে আমার অন্তর্ভুক্তি ঘটে।

সবশেষে, দেশের অনগ্রসর ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে, তা আগামীতে আরো শক্তিশালী এবং বেগবান হবে সে বিশ্বাস রাখতে চাই। পিকেএসএফ-এর সফলতায় আমরা আনন্দিত, আমরা গর্বিত। সবাইকে পিকেএসএফ দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

নিরাপদ খাদ্য ও পিকেএসএফ

মাহমুদা বেগম
সদস্য, সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম নিয়ামক কৃষি। দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমাদের ছোটোবেলায় যখন বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৭ কোটি, সেই সময়ে আমরা অভাব দেখেছি। বহু মানুষ দু'বেলা পেটপুরে খেতে পারতো না। আজ দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটির ওপরে, কিন্তু আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটি সম্ভব হয়েছে উচ্চফলনশীল হাইব্রিড বীজ, প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার প্রয়োগ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে। অতীতে প্রকৃতি-নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা ছিল, ফলে উৎপাদন অনেক কম হতো কিন্তু উৎপাদিত খাদ্য ছিল নিরাপদ।

বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ও চাষ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এখনকার উৎপাদিত কৃষিপণ্য কতটা নিরাপদ? বর্তমানে বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমাদের খাদ্যপণ্যে মাত্রাতিরিক্ত বিষাক্ত বস্তুর উপস্থিতির বিষয়টি প্রতিনিয়ত প্রচার করা হচ্ছে। আজ আমরা মুরগি, চাষের মাছ, শাকসবজি ও ফলমূল বাজার থেকে কিনে খেতে ভয় পাচ্ছি। প্রশ্ন জাগে, আমরা কি খাবারের সঙ্গে বিষ খাচ্ছি?

পত্র-পত্রিকার তথ্যমতে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভেজাল খাদ্যের উৎপাদন ও সরবরাহে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। খাদ্যে বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতিতে এ এলাকার বহু মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে আছে। ভেজাল খাদ্য মানুষের ফুসফুস, পাকস্থলীতে ক্যান্সার সৃষ্টিসহ লিভার ও কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সর্বোপরি, খাদ্যে বিষাক্ততার জন্য মানুষ অতি অল্প বয়সে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।

দেশের কৃষকরা ফসল উৎপাদনের সময় জমিতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ করছেন। রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে ফল পাকিয়ে তা যত্রতত্র বাজারজাত করা হচ্ছে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে পোল্ট্রির খাবার ও ঔষধ উৎপাদন করছে, যা মুরগির দ্রুত ওজন বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে এগুলো মানবদেহে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

আমার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জিত হয়েছিলো প্রাণিবিদ্যা বিভাগের কীটতত্ত্ব শাখা থেকে। ফলাফল বের হওয়ার আগেই সিভিল সার্ভিসে যোগদান করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জিত জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ আমার হয়নি। চাকরির শুরুতে সিআরপিসি, পেনাল কোড, সাক্ষ্য আইন, ভূমি আইনসহ নানাবিধ আইন বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হয়েছে। পরবর্তীকালে অর্থনীতি, ফাইন্যান্স, পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বাজেট এবং তারও পরে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনা, দ্বিপাক্ষিক ও

বহুপাক্ষিক নেগোসিয়েশন, ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি, জলবায়ু পরিবর্তনসহ সরকারের পলিসি প্রসিডিউর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে।

সরকারের উক্ত কাজ করতে গিয়ে যখন কৃষিখাত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিকল্পনা, নেগোসিয়েশন ও মনিটরিং করেছি, তখন থেকে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিষয়টি চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল। প্রকল্প পরিদর্শনকালে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এ সাধারণ পর্ষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর এটি আরো পরিকল্পিতভাবে চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনায় ইতিবাচক পরিবর্তন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিকেএসএফ অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুধা নিবারণ ও দারিদ্র্য বিমোচন থেকে শুরু করে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাসহ এসডিজি'র অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জনে এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে।

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন বিষয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি, মৎস্য ও প্রণিসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভ্যালু চেইন ও বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে নিরলস কাজ করছে পিকেএসএফ। Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্প, Sustainable Enterprises Project (SEP), Rural Micro-Enterprises Transformation Project (RMTP) এবং LIFT কর্মসূচি ও সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে নিরাপদ কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পিকেএসএফ-এর কারিগরি, আর্থিক ও লাগসই প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তায় নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছে। এসব প্রকল্প ও কর্মসূচি হতে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের ব্যাবসায়িক দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবসায়িক মনোভাব সৃষ্টি এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত খামারগুলো বিষমুক্ত সবজি, ফল ও পোল্ট্রি উৎপাদন করে বাজারজাত করছে। এগুলো নিরাপদ পণ্য হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত রেখে তা সারা বাংলাদেশে সম্প্রসারণ করা হলে নিরাপদ খাদ্য আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে আশা করা যায়।

বিগত ৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে কক্সবাজার জেলায় কর্মরত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা Coast Foundation-এর কয়েকটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরাপদ উপায়ে খাদ্য উৎপাদন করে উৎপাদনের অগ্রযাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, কক্সবাজার-এর রামু উপজেলার একজন উদ্যোক্তা যিনি দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। তার ইচ্ছে ছিল লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করবেন। তখন তার পরিচয় হয় Coast Foundation-এর সঙ্গে। তাদের পরামর্শ ও কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তার পিতার পরিত্যক্ত তিনটি পাহাড়ে 'Chicken Coop Model Farm' গড়ে তুলেছেন। এ খামার করার জন্য পিকেএসএফ-এর RMTP'র আওতায় তাকে অনুদান সহায়তার পাশাপাশি লাগসই কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পাহাড়ের চারদিকে নেটের বেড়া দিয়ে ভিতরে দেশি জাতের মোরগ-মুরগি অবাধে চলাচলের সুযোগ রেখে লালন-পালন করা হচ্ছে। রাতের বেলা বিশ্রাম ও ডিম দেয়ার জন্য শেড নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। এ খামার থেকে ডিম সংগ্রহ করে খামারের নিজস্ব হ্যাচারিতে বাচ্চা ফুটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাণিগুলো দিনের বেলায় খোলা জায়গা থেকে কীটপতঙ্গ ও ঘাস খেয়ে খাদ্যের চাহিদা মেটাতে পারছে। পাশাপাশি, সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা হয়, যা উৎপাদন করা হচ্ছে উদ্যোক্তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়। এর ফলে তার খামারে প্রাণিদের বিষমুক্ত খাদ্যের নিশ্চয়তা করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, পুরো চেইনে কোথাও বাইরের কোনো সংস্পর্শ রাখা হয়নি। চারদিকে নেট থাকার কারণে বাইরের রোগাক্রান্ত প্রাণী ও বন্যপ্রাণির আক্রমণের হাত থেকে তার ফার্মের প্রাণিগুলো নিরাপদ থাকছে। রোগ-বালাই নিরাময়ের জন্য স্থানীয় পশু চিকিৎসক ও Skz Vet Clinic-এর সঙ্গে

সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে দেয়ার ফলে যথাসময়ে প্রাণিগুলো মেডিসিনসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সহায়তা পাচ্ছে।

নিরাপদ উপায়ে খাদ্য উৎপাদনে উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলকভাবে অধিক, তাই বাজারজাতকরণ কঠিন হতে পারে। এ বিষয়টিও তাদের পরিকল্পনা থেকে বাদ যায়নি। Mobile phone-based ডিজিটাল মার্কেটিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রেতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে দেয়ার ফলে সচেতন ক্রেতারা তার খামার থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয় করছেন। ব্র্যান্ডিং-এর মাধ্যমে পণ্যের গুণাগুণ প্রকাশিত হওয়ার কারণে ক্রেতারা বিশ্বাস করছে যে, পণ্যটি নিরাপদভাবে উৎপাদিত। এ কারণে বাজারের তুলনায় মূল্য বেশি হলেও সচেতন ক্রেতারা তার খামার থেকে পণ্য ক্রয় করছেন। তিনি প্রতি কেজি লাইভ মুরগি বিক্রি করছেন ৫৫০ টাকা। তারপরও তাকে বাজারে গিয়ে মুরগি বিক্রি করতে হয় না। বর্তমানে তার পণ্যের চাহিদা এত বেশি যে, চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। যেহেতু বাজারে নিরাপদ পণ্যের একটি চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, তাই আশেপাশের খামারিরাও এ পদ্ধতিতে উৎপাদন করতে এগিয়ে আসছেন। সর্বোপরি, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিষয়ে এলাকায় সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। খামারির সঙ্গে আলোচনাকালে পরামর্শ দেয়া হয় যে, তিনি যদি খামারে মুরগি পালনের পাশাপাশি সমন্বিতভাবে শাক-সবজি ও ফলের চাষ করেন, তবে তার খামার টেকসই হবে এবং তিনি এ খামার থেকে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারবেন।

পিকেএসএফ-এর দুই শতাধিকেরও অধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য আন্দোলনের এ কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেয়া হলে তা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। নির্দিষ্ট এলাকায় মডেল খামার স্থাপন করা হলে, সফল ও দৃশ্যমান প্রযুক্তি সারা বাংলাদেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্প্রসারিত হবে। এভাবে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলেও আশা করছি।

একটি প্রতিষ্ঠানেই সমগ্র কর্মজীবন

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

দেখতে দেখতে ৩৩ বছর কেটে গেল। প্রথা অনুযায়ী আগামী বছর এ দিনটি আসার পূর্বেই হয়তো আমার বিদায় নিতে হবে পিকেএসএফ থেকে। পিকেএসএফ সৃষ্টির ইতিহাস যারা জানেন না, তাদের জন্য সংক্ষিপ্তভাবে একটু বলা আবশ্যক। পিকেএসএফ ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশ্বব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করে ১৯৮৪ সালে। এই আলোচনা চলে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এবং সেই বছরের নভেম্বরের ১৩ তারিখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি "ফাউন্ডেশন" গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ১৯৯০-এর এপ্রিলে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পিকেএসএফ-কে ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে সিদ্ধান্ত মোতাবেক, পিকেএসএফ ১৯৯০ সালের ২রা মে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ দফতর থেকে কোম্পানি আইন ১৯১৩-এর অধীনে নিবন্ধন লাভ করে। এখানে উল্লেখ না করলেই নয় যে, ফাউন্ডেশন সৃষ্টির পেছনে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৮৪ সাল থেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের সৃজন প্রক্রিয়ায় গঠিত কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রস্তাবিত "ফাউন্ডেশন" গঠনের প্রস্তাবের সাথে দ্বিমত পোষণ করে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে দেশীয় ভাবধারার সাথে সঙ্গতি রেখে ভিন্নধর্মী একটি "ফাউন্ডেশন" গঠনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। এর ধারাবাহিকতায়, তৎকালীন সরকার অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ফাউন্ডেশনের রূপরেখা রচনার দায়িত্ব প্রদান করে। এরই ফলশ্রুতিতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৯০ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব এম. সাইদুজ্জামানকে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের মহাপরিচালক জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীকে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করেন। অপর বেসরকারি তিনজন সদস্যও রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেন। তারা হলেন জনাব বেগম তাহেরুন্নেসা আব্দুল্লাহ, জনাব এ. এ. কোরেশী এবং অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশনের প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে সরকার জনাব বদিউর রহমানকে মনোনীত করে।

বিদেশ থেকে লেখাপড়া শেষ করে আমার প্রথম চাকরিতে যোগদান পিকেএসএফ-এই; সালটি ছিল ১৯৯১। পরিচালনা পর্ষদে দেশের শীর্ষস্থানীয় খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সমন্বয় দেখে এ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার আকর্ষণটা বেড়ে গিয়েছিলো। বিশেষ করে, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস তখন খুবই পরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব। তাঁকে সকলেই এক নামে চেনে। শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা হিসেবে পিকেএসএফ-এ যোগদান করার পর পরই আট দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ এক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করি। মনে আছে, ধানমন্ডির ২৭ নং রোডের ২৩ নম্বর বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ছোট্ট একটি মিলনায়তনে আমাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিলো। দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিবৃন্দ রিসোর্সপার্সন

হিসেবে আমাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন জনাব গাজী সামসুর রহমান, ড. রফিকুল ইসলাম, ব্যারিস্টার ফিদা কামাল এবং পর্ষদ সদস্য জনাব বেগম তাহেরুন্নেসা আব্দুল্লাহ। এরপর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব বদিউর রহমান আমাদেরকে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য পাঠালেন গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে। সেখানে পরিচয় ঘটে গ্রামীণ ব্যাংকের দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত জনাব খালেদ শামস-এর সাথে। তার কাছে প্রথম গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ধারণা লাভ করি। আর এ জন্য সাহায্য করেছিলেন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রশিক্ষণ শাখার দায়িত্বে থাকা জনাব জান্নাত-ই-কাওনাইন। তার নেতৃত্বে ১০/১৫ দিনের প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হলো গ্রামীণ ব্যাংকে।

প্রশিক্ষণ পর্বের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়টি ছিল রাজবাড়ী জেলার কোনো এক নিভৃত উপজেলায় (নাম মনে করতে পারছি না) গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখা অফিসে ছয় দিন অবস্থান। সেখানে না ছিল ভালো টয়লেটের ব্যবস্থা, না ছিল গোসলখানা। একটা কচুরিপানায় পূর্ণ পুকুরে গোসল করতে হয়েছিলো; টয়লেটের কথা না-ই বা বললাম। পরের প্রশিক্ষণ ছিলো ব্র্যাকে। সাতদিন ব্র্যাকে অবস্থান এবং এক মাস কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে কাটিয়ে আমাদের পেশাগত কাজ শুরু করতে হলো। পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে অবস্থানকালীন একটি ঘটনা কোনোদিনই ভুলবার নয়। ফাউন্ডেশনের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব বদিউর রহমান আমাদেরকে দেখতে গেলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লাতে। স্যারকে দেখে আমরা ভীষণ খুশি; অনেক গল্প করে সময়টা ভালোই কেটেছিলো। হঠাৎ স্যার আমাদের অনেকটা পরীক্ষা নেয়ার মতো করে জিজ্ঞেস করলেন, "কুমিল্লা শহরে কে কে গিয়েছেন?" স্যার সম্ভবত স্টেশন ত্যাগ কে করেছে, এটা জানার জন্যই ঐ প্রশ্নটা করেছিলেন। আমরা আসলে কেউই স্টেশন ত্যাগ করিনি এবং স্যারকে জানিয়ে দিলাম যে আমরা কেউই কুমিল্লা শহরে যাইনি এবং স্যারকে এটাও জানিয়ে দিলাম যে, আমাদের ইচ্ছে রয়েছে কুমিল্লা শহরে যাওয়ার কারণ কুমিল্লার রসমালাই খেতে আগ্রহী ছিলাম। উল্লেখ্য, আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে কেউই তখন পর্যন্ত কুমিল্লার রসমালাই খাননি। যথারীতি সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা স্যারকে বিদায় দিয়ে খেলার মাঠে গেলাম এবং ফিরে আসার পথেই একজন কেয়ারটেকার আমাদের বললেন যে, বদিউর রহমান স্যার আবার এসেছিলেন এবং আমাদের জন্য তিনটি মিষ্টির প্যাকেট রেখে গেছেন। সবাই এক দৌড়ে গিয়ে দেখি তিনটিতেই কুমিল্লার রসমালাই। আমরা সেই প্রথম কুমিল্লার রসমালাইয়ের স্বাদ গ্রহণ করি। কিন্তু আজীবনের জন্য শিক্ষণীয় হলো, কর্মীদের ইচ্ছে পূরণে তত্ত্বাবধায়কদের দায়িত্ব কতো গভীর হতে পারে।

কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস না থাকলে একটি টিম তৈরি হয় না। পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক নেতৃত্ব প্রদান করেন এই মানুষটি; তাঁর নিকট আমি ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ কৃতজ্ঞ। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বাচনভঙ্গি এবং স্বপ্ন দেখানোর কৌশল আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। এ টিমে অন্য একজন মানুষের কথা না বললে পরিপূর্ণ হবে না। তিনি হলেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক জনাব ইব্রাহীম খালেদ। ফাউন্ডেশনের প্রথম চেয়ারম্যান জনাব এম. সাইদুজ্জামান-এর বলিষ্ঠ দিক-নির্দেশনায় একটি গতিশীল টিমে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে হয়েছিলো। উল্লেখ্য, ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৬ ভাগ। ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে পিকেএসএফ ২৩টি সহযোগী সংস্থাকে ২৯,৯৫,০০০ (উনত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করেছিলো। এই ২৩টি সহযোগী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে ৯৭.৭৮ কোটি টাকা ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ করেছিলো। সংস্থাসমূহের সংগঠিত সদস্য সংখ্যা ছিল ৬.৭৬ লাখের মতো।

তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যাদের পেলাম, তারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র ও মার্জিত। আমরা সকলেই তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করে অতি দ্রুত প্রাথমিক কাজ-কর্ম শিখে ফেললাম। পরবর্তীকালে, কয়েকটি

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের তদারকির দায়িত্ব পেলাম। সেই থেকে ভিন্নধর্মী পথচলা। প্রতি মাসে ২০/২২ দিন কাটাতে হতো মাঠ পর্যায়ে। কখনো লঞ্চে, কখনো বাসে কখনো বা বিমানে করে যেতে হতো বিভিন্ন জেলায়। সহযোগী সংস্থাসমূহ তত্ত্বাবধান করার পাশাপাশি বড় একটি কাজ ছিলো ফাউন্ডেশনের ঋণের জন্য আবেদনকৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে গ্রহণ করা। এ কাজ করতে গিয়ে অনেকটা গোয়েন্দগিরিও শিখে ফেলেছিলাম। কে কোন উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে, তা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। পিকেএসএফ-কে একটু একটু করে ভালোবাসতে শুরু করলাম। কাজের সাথে জীবনের উদ্দেশ্যের মিল পেতে আরম্ভ করলাম। মানুষের জীবন তো শুধু টাকা রোজগারের মাধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; জীবনের সার্থকতা হলো অন্যের কল্যাণে অবদান রাখাও। মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শকে সমুন্নত রেখে অত্যন্ত সততার সাথে মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থা নির্বাচনই পরবর্তীকালে একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলো, যা আজও চলমান।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখার সুযোগ আমাদের আরো দায়িত্বশীল করে তুললো। আমরা হয়ে গেলাম প্রতিষ্ঠান তৈরির কারিগর। প্রতিটি জেলা/উপজেলায় একটি করে দরিদ্রবান্ধব ও জনকল্যাণকর সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হলো। এরপর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যারা এসেছেন, প্রত্যেকেই ধীরে ধীরে পিকেএসএফ-কে এগিয়ে নিয়ে গেছেন উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে। এ যাত্রায় যাদেরকে স্মরণ না করলেই নয়, তারা হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে সর্বজনাব মোহাম্মদ ইসমাঈল হোসাইন, এম.এ.এম. জিয়াউদ্দিন, ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ও ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। চেয়ারম্যান হিসেবে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ও ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ পিকেএসএফ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রত্যেকেই অবদান রেখেছেন পিকেএসএফ-কে দুর্নীতিমুক্ত ও জনমুখী একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে। হাজার হাজার কোটি টাকা সহযোগী সংস্থাসমূহে বিতরণ করা হয়েছে, কিন্তু কোনো অর্থের লোভ পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের স্পর্শ করতে পারেনি – এমন উদাহরণ সৃষ্টি করেছি আমরা।

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে প্রতিষ্ঠান মাত্র ৩ (তিন) কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে পথচলা শুরু করেছিলো, বর্তমানে তার সম্পদের পরিমাণ ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ হয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি ঋণ, ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ হিসেবে। দারিদ্র্যের বহুমুখিতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নেয়া হয়েছে নতুন নতুন কর্মসূচি ও প্রকল্প। সহযোগী সংস্থাসমূহ ক্রমান্বয়ে বিন্দু থেকে বৃত্তের রূপ ধারণ করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে সহযোগী সংস্থা পর্যয়ে, কোটি মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে সদস্য পর্যায়ে। নব্বইয়ের দশকে পিকেএসএফ সৃষ্টি না হলে আজ ক্ষুদ্র ঋণের এ ব্যাপকতা অনুমান করা দুরূহ ছিলো। কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে পিকেএসএফ; এর সুনাম দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও পৌঁছেছে। উন্নয়ন সহযোগীরা একবার কোনো প্রকল্পে অর্থায়ন করলে, বার বার অর্থায়ন করতে থাকে। এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে পিকেএসএফ-এর নিবেদিত কর্মীবাহিনী ও সহযোগী সংস্থার কর্মীবৃন্দের দক্ষতা ও নিষ্ঠায়। পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সুনিপুণ দিক-নির্দেশনা, সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন ও একটি সুদক্ষ কর্মীবাহিনী থাকলে একটি প্রতিষ্ঠান যে কতোটা উচ্চ মানসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে, পিকেএসএফ তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভবিষ্যতেও পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহ জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি সম্প্রসারণের গতিময়তা ধরে রেখে দারিদ্র্য বিমোচনে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে – সেটাই আজকের দিনের প্রত্যাশা ॥

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পিকেএসএফ

ড. মোঃ আবদুল মুঈদ
সাবেক সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, পিকেএসএফ

দরিদ্রতা, কর্মসংস্থানের অভাব, বেকারত্ব সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য অভিশাপ। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ জনগণের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিতকল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দরিদ্রতার হার হ্রাস, মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়েই ঊনিশশত আশির দশকে সরকারের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন আলোচনা পর্যালোচনা শেষে ১৯৮৯ সালের ১৩ নভেম্বর মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয় এবং একটি অলাভজনক ও জন উন্নয়নে সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ প্রায় দুই শতাধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

জনগণকে যেকোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজন পুঁজির। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তহবিলের সাথে নিজস্ব তহবিল এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পিকেএসএফ বাস্তবায়ন করছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প। দুই শতাধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, ঋণ ব্যবহারে যথাযথ কারিগরি জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রদান ও তদারকির মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য ১.৮৯ কোটি, যার ৯১.৫৩% নারী। একই সময়ে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১.৪৪ কোটি, এর মধ্যে নারী ১.৩২ কোটি, যা মোট ঋণ গ্রহীতার ৯১.৬৭%। এ পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমেয় যে, আমাদের সমাজের পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে পিকেএসএফ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করেছে এবং তারাও নিজেদের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখছে।

দেশের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবনমান উন্নয়নে পিকেএসএফ মূলস্রোতভুক্ত নানান ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যা জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণে অবদান রাখছে। এর মধ্যে আবাসন, অগ্রসর, বুনিয়াদ, জাগরণ, সুফলন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অনগ্রসর মানুষের বসবাসের জন্য নতুন বাড়ি নির্মাণ, পুরাতন বাড়ি সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে 'আবাসন' শীর্ষক ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় জুন ২০২৩ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ১৩,৯৯৩টি পরিবার মোট ৩২১.৬৭ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে নতুন বাড়ি নির্মাণ, পুরাতন বাড়ির সংস্কার এবং সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করেছে। দেশ থেকে টেকসইভাবে দারিদ্র্য দূর করতে হলে উদ্যোক্তা সৃষ্টির বিকল্প নেই। উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ 'অগ্রসর' ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। একজন উদ্যোক্তা অগ্রসর ঋণ কর্মসূচির আওতায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতধারায়

আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হলো বুনিয়াদ। এ কর্মসূচির মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের জন্য টেকসইভাবে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রাপ্য মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট্য হলো স্বল্প সার্ভিস চার্জ এবং ঋণ পরিশোধের ধরনে নমনীয়তা। পিকেএসএফ শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের আর্থিক পরিষেবার পরিধির মধ্যে কার্যকরভাবে নিয়ে আসার লক্ষ্যে 'জাগরণ' নামক ঋণ কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ-এর নিরন্তর প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিকভাবে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এ কর্মসূচি অর্থবহ ভূমিকা রাখছে। পিকেএসএফ-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঋণ কর্মসূচি হলো 'সুফলন'। এর আওতায় বিভিন্ন নমনীয় আর্থিক পরিষেবার কারণে কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড, যেমন শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, গবাদিপ্রাণি পালন, মৎস্য চাষ, কৃষি বনায়ন ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বেড়েছে। পণ্য বিক্রির পর এক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের বিধান 'সুফলন' কর্মসূচিকে ঋণ গ্রহীতাদের বিশেষত গরু মোটাতাজাকরণ এবং শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত কৃষকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে।

পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতধারার কর্মসূচি ছাড়াও রয়েছে বিশেষায়িত ইউনিট। এর মধ্যে একটি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাজের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও পিকেএসএফ জিসিএফ-এর অর্থায়নে ও সরকারি সহায়তায় নানাবিধ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় একটি ক্লাইমেট চেঞ্জ নলেজ হাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর আরেকটি বিশেষায়িত ইউনিট হলো সমন্বিত কৃষি ইউনিট। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভ্যালু চেইন ও বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে নিরলস কাজ করছে এ ইউনিট। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমন্বিত কৃষি ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এছাড়া, পিকেএসএফ-এর আরও কিছু কর্মসূচি রয়েছে যা গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে কাজ করছে। এর মধ্যে সমৃদ্ধি, কৈশোর কর্মসূচি, কর্মসূচি সহায়ক তহবিল, ঝুঁকি প্রশমনে কর্মসূচি, বিশেষ তহবিল, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে বাস্তবায়ন করছে বিভিন্ন প্রকল্প, যা গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে।

দেশের পিছিয়ে পড়া অবহেলিত জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পুঁজি হিসেবে অর্থায়ন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন, ঝুঁকি নিরসন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত মোকাবিলা, কৃষি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, স্যানিটেশন উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লবণাক্ত এলাকায় সুপেয় পানির ব্যবস্থা, আবাসন সুবিধা প্রদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে পিকেএসএফ হলো একটি নিবেদিত প্রতিষ্ঠান।

গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা ভবিষ্যতে আরো বেগবান হবে বলে আমার বিশ্বাস। সেই সাথে আমি পিকেএসএফ-এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে ধন্য মনে করছি। পিকেএসএফ দিবস ২০২৪-এর সফলতা কামনা করছি।

পিকেএসএফ: সারাদেশে ছড়িয়ে দেয় নিশাবসানের গান

শফি আহমেদ
সাবেক অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক সদস্য, সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ

সরকারি পরিকল্পনা-প্রযোজনা-আশীর্বাদে প্রতিষ্ঠিত পিকেএসএফ বা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন নামীয় একটি সুবৃহৎ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ সারা দেশে মাঠে-ঘাটে আনাচে-কানাচে যেমন চোখে পড়ে, তার বাঁশির স্বর আবার তেমনটি শোনা যায় না, অন্যদের কোলাহলে কিছুটা চাপা পড়ে যায়। সে কথা মানুষের কাছে, অন্তত অংশীজনদের কাছে পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে আমাকে ডাক দিয়েছিলেন এদেশের অগ্রগণ্য ও মৃত্তিকাভিসারী একজন অর্থনীতিবিদ। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক গ্রন্থিতে তাঁর সঙ্গে আমার জানাশোনাটা এমন যে, তাঁর কথা আমার জন্য অবশ্যমান্য। আরো বহু কোটি মানুষের মতো পিকেএসএফ বিষয়ে আমার জ্ঞান-গম্যি ছিল লজ্জাজনকভাবে সীমিত। অবশ্য সম্ভবত ২০০৪ সালে, তখন শিক্ষকতার অতিরিক্ত আমি প্রধানত নারীদের অবস্থান ও অধিকার বিষয়ে কাজ করে এমন একটা ক্ষুদ্রায়তন উন্নয়ন সংস্থার (Step Towards Development) ক্ষীণতনু ইংরেজি ত্রৈমাসিকের উপদেশক-সম্পাদক হিসেবে নাতিভার দায়িত্ব পালনকালে পিকেএসএফ-এর তদানীন্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ঠিক এই সময়ে যিনি অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। পিকেএসএফ বিষয়ে আমার সংক্ষিপ্ত ও আনুষ্ঠানিক জানাশোনার ঘটনাক্রমিক হাতেখড়ি ঘটেছিল এইভাবে। তখন পিকেএসএফ কার্যালয় ছিল ধানমন্ডি আট নম্বর সড়কে। নিছক পেশাগত দায় থেকেই ওই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। এই সংস্থাকে আরো গভীরভাবে জানার, হ্রস্ব পরিচয়ের অবগুণ্ঠন ভেদ করার, আলাদাভাবে ভালোবাসার কোনো বীজ তখনো রোপিত হয়নি।

২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হবার পর অনেকগুলি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে একটা মঞ্চ সংগঠিত হয়; লক্ষ্য – এ নীতি বাস্তবায়নে অতি-প্রয়োজনীয় Right to Education Act প্রণয়ন ও প্রবর্তনের জন্য সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করা। পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সহ-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই মঞ্চের সভায় যোগ দিতে প্রথম আগারগাঁওস্থ পিকেএসএফ ভবনে প্রবেশ করি। এ সংস্থা নাকি সরকারি! আর তা-ই যদি হয়, তা কী করে এমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন! তখন দূরাগত কল্পনায়ও ভাবিনি, এই ভবনই অদূর ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে আমার কর্মভূমি।

প্রায় চার দশকের শিক্ষকতা পেশা থেকে আনুষ্ঠানিক অবসর গ্রহণের কিছুকাল আগেই পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই সংস্থায় চুক্তিভিত্তিক যোগদানের জন্য। ইংরেজি বা বাংলা ভাষায় বিভিন্ন প্রকাশনা সম্পাদনায় আমার দক্ষতা বিষয়ে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল; UNESCO-র বার্ষিক প্রকাশনা Global Education Monitoring Report-এর বাংলা ভাষান্তর করেছি একাধিক বার; আমার সম্পাদিত কিছু পুস্তক ও প্রকাশনা তিনি দেখেছিলেন, এমনকি ইতোমধ্যে তাঁর তত্ত্বাবধানে

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ থেকে প্রকাশিত Asia-Pacific Journal on Environment and Development সাময়িকীর বেশ কয়েকটি সংখ্যার ভাষা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি।

অবসর-উত্তর বেকারত্ব বিনোদনে পিকেএসএফ-এ যোগ দেবার জন্য তাঁর নির্দেশে খুশিতে যে ডগমগ হয়ে উঠেছিলাম তা নয়; অনেকটা দ্বিধা, সংশয় ও অনীহা ছিল। পেশাগত জীবনের সবটাই শিক্ষকতা করেছি। কখনো পর পর ক্লাশ থাকলেও, তারপর শিক্ষক মিলনায়তনে আড্ডা দিয়েছি, বইয়ের খোঁজে গ্রন্থাগারে গেছি, শিক্ষার্থীদের নিয়ে নাটকের মহড়া বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নানা নকশা তৈরি করেছি, সেমিনার বা পরীক্ষার কাজে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বা বিদেশে গেছি। সব কাজের মধ্যেই বৈচিত্র্য ছিল। আর পিকেএসএফ-এ দশটা-ছয়টা অফিস কক্ষে বন্দী, আমার এ যাবৎ যাপিত জীবনের সঙ্গে মানায় না। প্রথম কয়েকটা দিন তেমন কাজের চাপ ছিল না, ঘরটাকে কারাগারই মনে হতো, পছন্দের বইয়ের পাতায় মনোযোগেও বাধা ঘটতো, মনে হতো এ আমার ঠাঁই নয়। সেই আমিই ক'দিনের মধ্যেই কাজের জোয়ারে ভাসতে লাগলাম, ভালো লাগাটা কোনো অগোচরে টান টান হয়ে উঠলো কীভাবে যে তা বুঝিতে পারিনি।

একটা বিষয় আমার মধ্যে অদ্যাবধি সদাজাগ্রত। আনন্দ না পেলে কাজ করতে পারি না। কখনো কখনো বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে অথবা ওপরওয়ালার ইচ্ছাপূরণে ঢেঁকি গিলতে হয়েছে, অবশ্য তার জন্য বদহজমের যন্ত্রণাও সইতে হয়েছে। পিকেএসএফ অফিসের দৃষ্টান্তমূলক শৃঙ্খলা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যবোধ এবং পরিশীলিত সৌজন্যবোধ আমাকে একাধারে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করেছিল। প্রাথমিক পর্বে বেশ কয়েকটি মাঠ পর্যায়ের গবেষণা প্রতিবেদন সম্পাদনা করতে গিয়ে বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়েছে। কিন্তু আমার লাভের অঙ্কটাও বড় ছিল। অন্যদের কাছ থেকে শিখনের চেয়ে ওইসব প্রতিবেদন পাঠ করে বুঝে নিতে পারছি কোন চরিত্রের কাজে ব্যাপৃত থাকে এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান।

সাধারণভাবেই বুঝতে পারতাম, কাদের নিয়ে কাজ করে পিকেএসএফ। গৎ-বাঁধা 'সুবিধাবঞ্চিত' বললে যেন বিষয়টা ঝাপসা থেকে যায়। সাহিত্যের ছাত্র হবার সুবাদে আমি যেন ওইসব জনগোষ্ঠীর ভূগোল, বাসস্থান, তাদের চারদিকের পরিবেশ, তাদের মুখের আদল, পরিধেয়, টিনের চাল, ঘরের অশক্ত দেয়াল, নারীদের কর্মঠ হাত কিন্তু মলিন মুখ এসব এঁকে নিতে পারছি। কোন সে গভীর প্রাণের টানে মনে পড়ে যেত রবীন্দ্রনাথের সেই অমর আহ্বান - 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা' বাস্তবে অনুবাদ করার প্রেরণায় কাজ করছে পিকেএসএফ-এর কর্মীদল। প্রথম দিকেই এই প্রতিষ্ঠানের কিছু প্রকাশনা পড়ে বুঝেছি এদের কাজের পরিধির কথা। কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে অর্থ প্রদান করা এবং তা ফেরৎ পাবার অঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য আহরণ করছি বটে, তবে তা যেন বইয়ের পাতার শব্দ বা অক্ষরই থেকে যায়, বিমূর্ততার খোলস ছেড়ে সেসব দিয়ে দৃশ্য রচনার রসদ যেন পেতাম না।

প্রতিবেদন সম্পাদনা করতে গিয়ে বুঝেছি, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা এবং বাস্তবায়নের পথনকশা। কিন্তু যখন দেখতে পাচ্ছি, সেই গ্রামীণ এলাকা, সেখানকার সেইসব পরিবার যাদেরকে যুক্ত করা হচ্ছে কর্মসূচিতে, তখন মূর্ত জীবন-কথার সংলাপ যেন শুনতে পেয়েছি আঞ্চলিক ভাষায়, যদিও তার মধ্যে অর্থনীতির অঙ্ক আছে, উন্নয়নের ভূগোল আছে। এমনভাবে পিকেএসএফ-এর সঙ্গে গড়ে উঠলো আনন্দের সম্পর্ক, কাজের সূত্র ধরেই। ছ'তলার মধ্যাহ্নভোজে ধীরে ধীরে অন্যান্যদের সঙ্গে মৈত্রী তৈরি হলো স্বাভাবিক নিয়মে। কাউকে জিজ্ঞেস করতে মন সাড়া দেয়নি; নিজে নিজেই একটা বাস্তব হেঁয়ালির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। দেশের শুধু বড় বড় কেন, মাঝারি আয়তনের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যালয় দেখেছি বিভাগীয়, জেলা এমনকি আরো দূর মফঃস্বলে। কিন্তু পিকেএসএফ-এর এই আগারগাঁওয়ের ভবনের মধ্যেই এর সার্বভৌম বিস্তার! গাঁয়ে-গঞ্জে গেলে তার প্রাতিষ্ঠানিক নাম ও

লোগো দেখা যাবে অজস্র স্থানে, কোন সংগঠনের সাইনবোর্ডে, পথের পাশে বা কৃষিজ উৎপাদনের আঙিনায়, কিন্তু রাজধানী ঢাকা ব্যতীত পিকেএসএফ-এর কোনো শাখা-প্রশাখার বিস্তৃতি নেই দেশের অন্য কোনোখানে।

আরো কিছুদিন পর, সম্পর্কের গভীরতা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে কোনোরকম সযতন প্রয়াস ছাড়াই, তখন বুঝলাম, পিকেএসএফ-এর আগুন না হলেও আঁচল ছড়িয়ে আছে দেশের সবখানে, বিস্তীর্ণ ভূগোলে। এখানে আমার কর্মকালীন অবস্থায় এই বিস্তার হয়েছে বিপুল সমারোহে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক সংগঠন। এদের সবারই আলাদা বংশ পরিচয় আছে, আবার এরা সবাই পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংগঠন। এই প্রতিষ্ঠানগুলিই কর্মে, চিন্তায়, নিষ্ঠায়, মানুষের প্রতি মমতায় এবং দেশাত্মবোধের সকর্মক অনুবাদে পিকেএসএফ-এর দৃশ্যমান শাখাপল্লব এবং উন্নয়ন ভাবনায় অদৃশ্য শেকড়। এভাবেই ঢাকা ছড়িয়ে গেছে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথে, বিশুষ্ক রাঢ় অঞ্চলে, পাহাড় ও বনের প্রতিবেশী সদর্থক উন্নয়ন প্রত্যাশী এলাকায়। ভালোলাগা ও ভালোবাসার সূত্রে ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এমন সংগঠনের পিকেএসএফ-এর সঙ্গে যুক্ত হবার প্রক্রিয়া অবশ্য সাদামাটা নয়। না, কৌলীন্যের মর্যাদা কোনো মাপকাঠি নয়; রূপে ভোলানো যাবে না; গুণই হলো আবশ্যিক, সততা, দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা এবং মানব মর্যাদার যথার্থ অনুশীলন।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কর্মমুখী এবং উৎপাদনমুখী কার্যক্রম ও প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকে। আর্থিক সহায়তা অবশ্যই প্রাধান্য পায়, কিন্তু প্রাপ্ত অর্থ যাতে মূলধন অথবা দক্ষতা উন্নয়ন সাপেক্ষে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে সাহায্য করে, সে ধরনের রক্ষাকবচ সৃষ্টিতে তৎপরতা থাকে সর্বদা। কর্মসূচি সফল করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় পরিচালন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। এ অনুচ্ছেদের ওপরে উল্লিখিত শব্দাবলি হয়তো আরো অনেক সফল সংস্থার কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু যা আক্ষরিক, গুণগত ও প্রায়োগিক অর্থে পিকেএসএফ-কে যথার্থভাবে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে, তা হলো উদ্দীষ্ট জনমানুষের সর্বসামগ্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। সেখানে কৃষি উৎপাদন বা ক্ষুদ্র-উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত লাভ যা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অপরিহার্য উপাদান, শুধু সেটাই পরিগণ্য নয়, কার্যক্রমভুক্ত জনগোষ্ঠী যাতে মানবিক বা মানবহিতকর গুণাবলি অর্জন করে, স্বাস্থ্যসুরক্ষার অনুশীলন করে, শিশুদের শিক্ষাদানে মনোযোগী হতে পারে, সমাজকল্যাণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রবীণ-নবীন সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করতে পারে এবং খেলাধুলা ও সুস্থ লোকসংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সমাজের মানসিক বিকাশ সংহত করতে পারে - এমন এক মিলিত উদ্যোগের সর্বজনীন অনুশীলনকে পিকেএসএফ নিরলসভাবে পরিপোষণ করে থাকে।

পিকেএসএফ প্রকাশনার বিষয়-আশয়ের বৈচিত্র্যের খোঁজে, যা বলি, লিখি, শুনি সেসব গল্প বাস্তবে কেমন তা আবিষ্কারের প্রেরণায় ও মনের আনন্দে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গেছি, সেইসব প্রান্তরে যেথায় ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাসের ছন্দ, ভরা ক্ষেতে অঘ্রাণের খুশিকে স্পর্শ করা যায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন যাতে পরিকল্পনামাফিক ঘটে, সে বিষয়ে ঢাকা কার্যালয়ের নির্দেশনা আছে জানি, কিন্তু গ্রামে গিয়ে যা দেখেছি তা হলো আত্মোন্নয়নের বিবিধ লক্ষণ। মানুষ ভাবছে, তাদের আগামী দিনের কথা, আগামী প্রজন্মের কথা, বর্তমানকে সুশোভন করার জন্য স্ব-উদ্যোগে গৃহীত হতে পারে এমন পদক্ষেপের কথা। পিকেএসএফ আগুনের সলতেটা শুধু জ্বালিয়ে দিয়েছে। যৌথ উদ্যোগে নির্মিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির যে স্বল্পায়তন কক্ষে শিশুদের শিক্ষা সহায়তা দেয়া হয়, বিকেলে-সন্ধ্যায় স্থানীয় মানুষ সেখানে জড়ো হয়, খবরের কাগজ পড়ে, নানাজনের খোঁজ-খবর নেয়, কারো সমস্যায় কীভাবে সাহায্য করা

যায়, তার পথ খোঁজে, সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে, এমন আপ্তবাণীর বাস্তবায়নে সামষ্টিক উদ্যোগ গ্রহণে দিশার সন্ধান মেলে।

আমি দেখেছি, উত্তর সীমান্তে পিকেএসএফ-এর একটি সহযোগী সংস্থা তেভাগা আন্দোলনের ভাস্কর্য গড়ে ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে, মাটির জাদুঘর নির্মাণ করেছে, সাঁওতাল গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বিকাশে মনোযোগী, স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে তাদের সংস্কৃতির কৃত্য পরিচর্যায় সাহায্য করেছে। আমি দেখেছি, মধ্যবয়সী নারীর চোখে সেই দীপ্তি যার মুখে প্রভাতী সূর্যের আলো ফুটে উঠেছে। দূরগ্রামে কিশোরী দলের আত্মবিশ্বাসী সাইকেল চালনার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি আগামী দিনের সাফল্যের সংকেত; ওরাই আবার সবিক্রমে রুখে দেয় বাল্যবিবাহ। চর কুকরিমুকরিতে সন্ধ্যা নামে ঠিকই, কিন্তু ওই জনপদের মানুষরা জানে কয়েক ঘণ্টা পরেই পুব গগনে দেখা যাবে আলোর রেখা। পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি এদের শিখিয়েছে কীভাবে লড়তে হয় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। এই একই কথা সাজে হাতিয়া'র জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে। সুদিনের বার্তাবাহী এমন সব প্রতিশ্রুতিময় কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হবার, ঘনিষ্ঠ চোখে যা দেখবার এবং আপ্লুত হবার ধন্যি সুযোগ আমাকে করে দিয়েছে পিকেএসএফ। এসব কথা লিখতে গিয়ে নিজেকে সমাজের জন্য আংশিকভাবে হলেও প্রয়োজনীয় বোধ করেছি। সহযোগী সংস্থার কর্মী সংগঠকদের মধ্যে যে উদ্দীপনা দেখেছি, দেশ ও সমাজকে পরম নৈকট্যে দেখতে বুঝতে তাদের যে অসামান্য আন্তরিক সাহচর্য পেয়েছি, আমৃত্যু তা ভুলবো না। পিকেএসএফ দেশব্যাপী গড়ে তুলেছে অজস্র উন্নয়নের ঠিকানা। তার ঢাকার কেন্দ্রীয় ঠিকানায় আমিও যে দিনভর বাস করেছি ক'বছর। এ আমার পরম প্রাপ্তি।

আলোর মিছিলে অভিযাত্রা: পিকেএসএফ-এর সাথে তিন দশক

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
সদস্য, সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ
এবং নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সে সময়ে আমরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করি। বন্যা পরবর্তী সময়ে দুর্গত মানুষেরা কৃষি কাজে সহায়তার জন্য আমাদেরকে অনুরোধ জানায়। সে সময় আমাদের সীমিত সামর্থ্যে মাঠ পর্যায়ে ১৪,০০০ টাকা সুদমুক্ত মৌসুমী ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ইএসডিও'র আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

১৯৯১ সালে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় প্রস্তুতি নিচ্ছি সে সময় খবরের কাগজে পিকেএসএফ-এর 'সহযোগী সংস্থা'র জন্য আগ্রহপত্র আহ্বান করে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সে অনুযায়ী আমরা আবেদন করি। স্বেচ্ছাসেবী কাজের বাইরে কোনো দাতা সংস্থা কিংবা সরকারের অর্থায়নে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের ছিলো না। এমনকি এর আগে আমরা কোনো প্রতিষ্ঠানে আবেদনও করিনি। আগ্রহপত্র জমা দেয়ার কিছুদিন পর পিকেএসএফ-এর একজন ব্যবস্থাপক পরিদর্শনে আসেন। সে সময় আমাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি ছিলো না। তারপরও তিনি আমাদের আগ্রহ এবং দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার অঙ্গীকারকে বিবেচনায় নিয়ে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পিকেএসএফ-এর বোর্ড সভায় সুপারিশ করেন এবং ইএসডিও সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ৫০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুরি লাভ করে। ১৯৯৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন সমাপ্তি শেষে প্রান্তিক মানুষের জন্য আজীবন কাজ করার স্বপ্ন নিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে ফিরে যাই এবং এ বিষয়ে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তা আমাকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করেন।

> নেদারল্যান্ডসের টিউলিপ ফুল বাংলাদেশে প্রথম খামার পর্যায়ে উৎপাদন করছে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার প্রান্তিক নারীরা। বাংলাদেশের প্রান্তিক নারীরা সামান্য পৃষ্ঠপোষকতা পেলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, তার ভালো উদাহরণ প্রান্তিক নারীদের টিউলিপ ফুল চাষ।

মঙ্গার স্থায়ী বিদায়

নব্বইয়ের দশকে আমরা যখন কাজ শুরু করি, সে সময় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল 'মঙ্গা অঞ্চল' নামে সর্বত্র পরিচিত ছিল। আশ্বিন-কার্তিক মাসে রংপুর বিভাগের গ্রামাঞ্চলের মানুষ কর্মহীন থাকতো; অনাহারে-অর্ধাহারে তারা দিনাতিপাত করতো। পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে ২০০৪ সালে প্রথম 'Financial Services for the Poorest (FSP)' প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয় এবং ইএসডিও এই প্রকল্প

বাস্তবায়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় বৃহত্তর পরিসরে ২০০৬ সালে 'Programmed Initiatives for Monga Eradication (PRIME)' প্রকল্পের মাধ্যমে পিকেএসএফ আক্ষরিকভাবেই রংপুর বিভাগকে মঙ্গামুক্ত করতে সক্ষম হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত।

ক্ষুদ্রঋণ থেকে উপযুক্ত অর্থায়ন

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হলেও সময়ের পরিক্রমায় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্যদের উপযুক্ত অর্থায়ন কার্যকর মডেল হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত হয়েছে। নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে কেবলমাত্র গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু ছিল। বিগত তিন দশকে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বৈচিত্র্যপূর্ণ উপযুক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে আমাদের কর্মএলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ থেকে নগর ক্ষুদ্রঋণ, অতিদরিদ্রদের জন্য ঋণ, পশু সম্পদ, কৃষি, গৃহায়ন, স্যানিটেশন, আপৎকালীন, উদ্যোক্তা ঋণ এমন নানামুখী ঋণের বৈচিত্র্যের ফলশ্রুতিতে সদস্যদের মাঝে টেকসইভাবে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জের হার, ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ ও নমনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে সদস্যদের সক্ষমতার পরিবেশ সুনিশ্চিত হয়েছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও উদ্যোগসমূহ: তৃণমূল মানুষের সার্বিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে কার্যকর মাইলফলক

কেবলমাত্র ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য সৃষ্টিতে খণ্ডিত প্রভাব ফেলে। পিকেএসএফ-এর সহায়তা এবং পরামর্শে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে 'দারিদ্র্যের ফাঁদ' থেকে আমরা সদস্যদের একটি বড় অংশকে উত্তরণ ঘটাতে পেরেছি। ঋণের পাশাপাশি কৃষি, স্বাস্থ্য, পশুসম্পদ সকল ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক কারিগরি সহায়তা এবং মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, সনদায়ন, বিপণন, ই-মার্কেটে অভিগম্যতা সর্বক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও উদ্যোগসমূহে সদস্যরা অর্জন করেছে দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য।

মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন

দরিদ্রতার বহুমাত্রিকতাকে বিবেচনায় নিয়ে এবং এসডিজি'র মূল দর্শন 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' – এ আস্থা রেখে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় আমরা কাজ করছি দুর্গম চরাঞ্চলে, সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাথে, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সাথে। এক্ষেত্রে মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমৃদ্ধি, কৈশোর কর্মসূচি, শিক্ষাবৃত্তি, পুষ্টি ক্লাব, সমতলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মাদকাসক্তি, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও জঙ্গিবাদ বিরোধী ১২৬ কিলোমিটার কিশোরী সাইক্লিং ও গণ-প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়।

ঠাকুরগাঁও জেলার ১২৬ কিলোমিটার পথ জুড়ে দিনব্যাপী লক্ষাধিক মানুষের অংশগ্রহণে ৫০০ কিশোরী এ সাইক্লিংয়ে অংশ নেয়। পাশাপাশি, ১,০০০ তরুণের অংশগ্রহণে ২০ কিলোমিটার ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়।

নারী উদ্যোক্তাদের মোজারেলা চিজ উৎপাদন

ঠাকুরগাঁও জেলাকে মোজারেলা চিজের রাজধানী বলা হয়। পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ইএসডিও বিগত দুই দশকে প্রায় ৫,০০০ নারীকে দুগ্ধখামার, চিজ উৎপাদন ও বিপণনের সাথে যুক্ত করেছে। পুরো উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে। দেশের সীমানা পেরিয়ে সদস্যদের উৎপাদিত মোজারেলা চিজ দক্ষিণ কোরিয়ার স্কুলের শিশুদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

প্রান্তিক নারীদের টিউলিপ ফুল চাষ

নেদারল্যান্ডসের টিউলিপ ফুল বাংলাদেশে প্রথম খামার পর্যায়ে উৎপাদন করছে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার প্রান্তিক নারীরা। বাংলাদেশের প্রান্তিক নারীরা সামান্য পৃষ্ঠপোষকতা পেলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রান্তিক নারীদের টিউলিপ ফুল চাষ।

টেকসই প্রতিষ্ঠান তৈরির কারিগর পিকেএসএফ

শূন্য থেকে ইএসডিও'র যাত্রাপথে পিকেএসএফ যুক্ত থেকেছে। বিগত তিন দশকে পিকেএসএফ-এর যথাযথ দিকনির্দেশনা, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা ইএসডিও-কে বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় পরিণত করেছে। এটি কেবলমাত্র ইএসডিও'র ক্ষেত্রেই ঘটেনি, প্রায় সকল সহযোগী সংস্থাকেই নিবিড় যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে পিকেএসএফ।

শেষ কথা

দীর্ঘ তিন দশকের অধিককাল ধরে অবিরাম প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার এমন ভালো উদাহরণ খুব বেশি নেই। এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় আমাদের যাত্রাপথ কখনও অমসৃণ ছিল, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে পিকেএসএফ-এর বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা ও সমর্থন সকল অমসৃণ পথকে মসৃণ করেছে। ফলশ্রুতিতে আলোর মিছিলের অভিযাত্রা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। পিকেএসএফ দিবসের শুভক্ষণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চরণ উল্লেখ করে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

"আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও,

মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।"

জয়তু পিকেএসএফ!

পিকেএসএফ-এর সাফল্যের গর্বিত অংশীদার শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

নাছিমা বেগম
নির্বাহী পরিচালক
শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ)

শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ) ১৯৮৫ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণ করে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ শুরু করে।

কাজ করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি, উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে অনেক কাজ করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র উপদেশ নয়, বরং প্রয়োজনে তাদের পক্ষে অবস্থান করে চাহিদা অনুসারে তাদের সাথে একযোগে কাজ করা, একটু একটু করে তাদেরকে হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সেই উপলব্ধি থেকেই আমরা সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছি। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সচেতনতা ও আর্থিক উন্নয়নে আমরা তাদেরকে স্বপ্ন দেখাতে চেষ্টা করেছি। সেই অনুভব থেকেই 'শিশু নিলয় আইডিয়াল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করে শিশু শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের যাত্রা শুরু হয়, যা যশোরের অন্যতম একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

> দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সদস্যদের চাহিদার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে 'পারিবারিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্প'-এর আওতায় ইউনিয়নভিত্তিক ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নির্যাতিত নারীদের আইনি সেবা প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান ও বাল্যবিবাহ বন্ধে কাজ করা হয়।

শুরুতে একজন নারী নির্বাহী পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার পথটি মসৃণ ছিলনা। কর্মএলাকায় এনজিও'র গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে অনেক সময় লেগেছে। সমাজের কিছু ব্যক্তিবর্গের চাঁদা ও অনুদানের সহযোগিতায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমে স্বাস্থ্য, শিশুশিক্ষা, নারীদের সংগঠিত করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। শুরুতে আমাদের কর্মীদের দক্ষতার অভাব ছিল। পরবর্তীকালে আর্থিক কারণে অনেকে ড্রপআউট হয়ে গেছে। এমনকি যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত ছিলনা। এমন শত প্রতিকূলতার মাঝেও আমরা প্রতিষ্ঠানের কাজ অব্যাহত রেখেছি।

শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন শুরুর দিকে দু'টি দাতা সংস্থার অর্থায়নে 'মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা' ও নারীর ক্ষমতায়ন (সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি) কার্যক্রম শুরু করে সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের আওতায় নারীদের গর্ভকালীন সেবা, নিরাপদ মাতৃত্ব, গর্ভোত্তর সেবা, টিকা প্রদান, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার পাশাপাশি নারীদের সংগঠিত করা এবং সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এসএনএফ। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সদস্যদের চাহিদার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে 'পারিবারিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্প'-এর আওতায় ইউনিয়নভিত্তিক ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নির্যাতিত নারীদের আইনি সেবা প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান ও বাল্যবিবাহ বন্ধে কাজ করা হয়।

এসএনএফ ১৯৯৭ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে নির্বাচিত হয়। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে আর্থিক, সাংগঠনিক, প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত উন্নয়নে আমাদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তাৎক্ষণিক সমাধানে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে পিকেএসএফ এসএনএফ-এর সম্প্রসারণে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। পিকেএসএফ-এর নিকট এসএনএফ-এর প্রত্যাশা ছিল অব্যাহত অর্থায়নের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সহযোগিতা পাওয়া। পিকেএসএফ অদ্যাবধি সংস্থার সামর্থ্য বিবেচনায় চাহিদা অনুযায়ী অর্থায়ন করা, সদস্য ও কর্মী পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, আইডি ঋণ প্রদান, পলিসি তৈরি, সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে। এসএনএফ দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে শিশু ও নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অন্যান্য দাতা সংস্থার নিকট হতে এখন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ফান্ড প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে এসএনএফ।

সংস্থার যেকোনো সমস্যা বা পলিসি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পিকেএসএফ-এর সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেও পরামর্শ ও সহায়তা আমরা পেয়ে থাকি। এমনকি আমরা অংশী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান পাই পিকেএসএফ-এর কাছ থেকেই। এসএনএফ-এর সদস্যদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, মানব মর্যাদা বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গত প্রায় তিন দশক যাবৎ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে সংস্থাটি। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিরূপায়ণ ঘটছে এবং তা স্থায়িত্বে রূপ নিচ্ছে যা প্রাতিষ্ঠানের ভিত আরও মজবুত করছে।

এই সংস্থার বহুবিধ কর্মসূচির একটি হলো ক্ষুদ্রঋণের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত ঋণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা নিশ্চিতের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। বর্তমানে ঋণ গ্রহীতাদের একটি অংশ উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে, যার মধ্যে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সদস্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে বেগম রোকেয়া পদক (পল্লী উন্নয়ন) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিগত ১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য হিসেবে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করায় আমরা পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই পর্ষদে পিকেএসএফ-এর সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দসহ দেশের বিভিন্ন সরকারি এবং স্বনামধন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ব্যক্তিবর্গ সদস্য হিসেবে রয়েছেন। পর্ষদ সভা হতে অর্জিত অভিজ্ঞতা এসএনএফ-এর গতিশীলতা বৃদ্ধিসহ কর্মসূচির গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। পিকেএসএফ-এর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্জিত সাফল্যে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন যে একজন অংশীদার এটা অনুভব করেও অত্যন্ত গর্ববোধ করি।

পরিশেষে, পিকেএসএফসহ অন্যান্য দাতা সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের এসএনএফ-এর উন্নয়ন সহযোগী সদস্যবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ ও টিএমএসএস

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম
(অশোকা ফেলো, পিএইচএফ অ্যান্ড একেএস)
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, টিএমএসএস

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি বহুবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রামেগঞ্জে কাজ করা বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বাজার উন্নয়ন এবং সহযোগী সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করার ব্রত নিয়ে নিজস্ব ভাবমূর্তি ও স্বাধীন সত্তার ওপর সরকারি উদ্যোগে ১৯৮৯ সালের ১৩ নভেম্বর মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিশেষ বিবেচনায় নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে স্বাধীন কাঠামো সংবলিত গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' গঠন করা হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বাজার উন্নয়ন ও সহযোগী সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক উপযুক্ত পরিমাণ অর্থায়ন, উদ্যোগ উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্য সহায়তা, দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত মোকাবিলা, স্যানিটেশন উন্নয়ন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি লোক পিকেএসএফভুক্ত সহযোগী সংস্থার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি উপকারভোগী। এই উপকারভোগীদের মাঝে শতকরা ৯১ জন নারী।

কালের পরিক্রমায় তথা দীর্ঘ ৩৪ বছরের পথচলায় দুই শতাধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর কর্মপরিধি বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি শহর-বন্দর, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন তথা প্রত্যন্ত গ্রামে বিস্তৃত। দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি লোক পিকেএসএফভুক্ত সহযোগী সংস্থার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি উপকারভোগী। এই উপকারভোগীদের মাঝে শতকরা ৯১ জন নারী। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর ঋণের সুদের হারও কম, যা সরকার কর্তৃক অভিনন্দিত। পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার ঋণ কার্যক্রম, দক্ষতা উন্নয়ন ও বাজার ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার ফলেই আজ দরিদ্র মানুষের, বিশেষ করে অবহেলিত নির্যাতিত নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মসংস্থান হয়েছে, নারীর সক্ষমতা, মানবিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের ফলে প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলেও শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে, শিক্ষার হার

বেড়েছে, বাল্য বিবাহের হার কমেছে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে, মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন হয়েছে, নারী নির্যাতন হ্রাস পেয়েছে এবং মহাজনী অতি উচ্চসুদের ব্যবসাও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

১৯৬৪ সালে ১২৬ জন ভিখারিনীর ভিক্ষার চাল/মুষ্টির চাল সংগ্রহ করে অতিদরিদ্র, অবহেলিত, অনাদৃত, ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দেয়া তথা হাসি ফুটানোর লক্ষ্যে গড়ে উঠা 'ঠেঙ্গামারা সবুজ সংঘ' নামক সামাজিক সংগঠনটি নানা বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে ১৯৮০ সালে পুনর্গঠিত 'ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)' নামে সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তরের নিবন্ধন লাভ করে দারিদ্র্য বিমোচনে বহুমাত্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। টিএমএসএস ১৯৯১ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর পিকেএসএফ-এর অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে টিএমএসএস-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করে হাতে-কলমে আমাদেরকে কাজ শিখিয়েছেন, টিএমএসএস-কে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বান্তকরণে চেষ্টা করেছেন। ঋণ ও হিসাব বিধিমালা, দৈনন্দিন লেনদেন পদ্ধতি, কার্যক্রম পরিচালন পদ্ধতি রাত জেগে আমাদেরকে শিখিয়েছেন। জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন, উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, ডকুমেন্টেশন, রিপোর্টিং, প্রকাশনা তৈরি প্রভৃতি আমাদেরকে শিখিয়েছেন, বুঝিয়েছেন এবং সরেজমিনে বাস্তবায়নে সহায়তা দিয়েছেন। ফাউন্ডেশনের আন্তরিক, নিবেদিত কর্মকর্তাগণের সেই সময়ের রাত জেগে পরিশ্রম ও কষ্টের মুখাবয়ব এখনও আমার মনে পড়ে। আমরা টিএমএসএস-এর পক্ষ থেকে বরাবরই তাঁদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও কৃতজ্ঞ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) টিএমএসএস-কে বিভিন্ন পর্যায়ে ঋণ তহবিল যোগান দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/কর্মসূচিতে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পিকেএসএফ-এর সহায়তায় টিএমএসএস অনুকূলে বিভিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং দাতব্য প্রকল্প যথা FSP, MFTS, MFMSFP, UPP, LRP, RESCUE, EFRRAP, PLDP, RNPPO, PRIME, SAHOS, DMF, Start-up Capital, Lease Financing, LRL, UP & FSVGD, বুনিয়াদ, জাগরণ, সাহস, সুফলন, আবাসন, LICHSP, KGF, LIFT, কৃষি ইউনিট, প্রাণিসম্পদ ইউনিট, মৎস্য ইউনিট, সাংস্কৃতিক ক্রীড়া, কৈশোর, ইউপিপি উজ্জীবিত, সমৃদ্ধি, হিজড়া জনগোষ্ঠী উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, DIISP, PACE, SDL, SEP, MDP, MDF-AF, LRMP, PPEPP, RMTP, BD Rural WASH ইত্যাদি জীবনঘনিষ্ঠ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে দরিদ্র মানুষের সচেতনতা, দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে পুঁজি সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে। টিএমএসএস তার কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, গ্রাম্য মাতব্বর, ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিবিদ সকলকে সম্পৃক্ত করেছে। ফলে কর্মকাণ্ডের সুফল ও স্থায়িত্ব অর্জিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

১৯৮৭ সাল; আমরা তখন বগুড়ার প্রায় ২০টি গ্রামে মুষ্টির চাল ছাড়াও ১ টাকা, ২ টাকা করে সঞ্চয় সংগ্রহ করতাম। সংগৃহীত সঞ্চয় দিয়ে ২০০, ৫০০ টাকা করে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে ঋণ দেয়া হতো। সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন ছিল, তাই আইনগত কোনো সমস্যা ছিল না। সঞ্চয় সংগ্রহের পাশাপাশি আমরা তখন পরিবার পরিকল্পনা, বনায়ন কার্যক্রম, ছোট্ট আকারে স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। পিকেএসএফ-এর সহায়তা না থাকলে হয়তোবা দেশব্যাপী প্রায় ২,০০০ অফিস ও ৪০,০০০ জনবলের মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিভূত প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ পরিবারে সেবা নিয়ে পৌঁছাতে পারতাম না। ফাউন্ডেশনের সহায়তা ছিল বলেই Population Award, Best Micro Finance Award, Family Planning Award, Forestation Award, Begum Rokeya Award-সহ শতাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছি।

১৯৯১ সালে মাত্র ১ লক্ষ টাকা সহায়তা নেওয়া টিএমএসএস এক সময় পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদেও জায়গা করে নেয় এবং দেশের অনেক উন্নয়ন সংগঠনকে সহায়তা দেয়ার সুযোগ পায়। আমাদের মধ্যে নৈতিক সাহস জোগানো, অনুপ্রেরণা দেওয়া, পাশে থেকে সহযোগিতা করা, সমস্যা হলে তার সমাধানে এগিয়ে আসা – এর সবই পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন করেছে অতি আপন অভিভাবকের মতো।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সকল চেয়ারম্যানবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ কারোরই স্মৃতি ম্লান করার সুযোগ নেই। বিশ্ব পরিমণ্ডলে এবং বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর তুলনায় সুশাসন শুদ্ধাচারে শীর্ষে থাকা পিকেএসএফ সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছে। স্বচ্ছতা, সুনাম ও কৃতিত্বের সাথে বহুমুখী সমন্বিত কার্যক্রমেরত থাকার চ্যালেঞ্জ বহনকারী টিএমএসএস-এর বেড়ে ওঠা, নানামুখী অর্জন ও খ্যাতিতেও পিকেএসএফ-এর অনবদ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৯৮৯ সালের ১৩ নভেম্বর পিকেএসএফ-এর জন্ম হয়েছিল বলেই আজ দেশের ১.৬০ কোটি পরিবার ক্ষুদ্রঋণের সুবিধাভোগী, জিডিপিতে যার অবদান ১৫ শতাংশ। গ্রামীণ অর্থনীতির ৭৪ শতাংশ অর্থের যোগান আসে ক্ষুদ্রঋণ খাত হতে। এনজিওদের অর্থের এবং কারিগরি সহায়তায় মূল যোগানদাতা পিকেএসএফ। Microcredit Regulatory Authority (MRA) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে PKSF-ই MRA-তুল্য PO-বান্ধব রেগুলেটরের ভূমিকা রেখেছিলেন।

জন্মদিনে পিকেএসএফ-কে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

মহান সৃষ্টিকর্তার উত্তম প্রতিনিধি মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর উত্তরোত্তর সুনাম বৃদ্ধি পাক, তৈরি হোক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান। সোনার বাংলার স্বপ্ন ও রূপকল্পের বাস্তবায়ন সফল হোক। আমরা আছি পিকেএসএফ-এর সাথে সদা-সর্বদা-সর্বত্রই।

পরিবর্তনের আহ্বান: কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

হুমায়রা ইসলাম, পিএইচডি
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক
শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিসএ্যাডভান্টেজড উইমেন

সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থিক উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর সবল ভূমিকা রয়েছে। পিকেএসএফ শক্তি ফাউন্ডেশন-সহ অন্যান্য সকল সহযোগী সংস্থাসমূহকে সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সর্বদা বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে।

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে আসছে শক্তি ফাউন্ডেশন। ENRICH প্রোগ্রামের আওতায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি এবং আয় বৃদ্ধি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যেখানে বিশেষত নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। WASH প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের ব্যবস্থা ও স্যানিটেশনের উন্নতি নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা নারীদের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক। পিকেএসএফ এবং শক্তি ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এসব প্রোগ্রামের কার্যক্রম পরিচালনা করে একে অপরকে সহায়তা করছে, যার মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে থাকা নারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে।

"নারীর ক্ষমতায়নে শক্তি ফাউন্ডেশন"- এই আদর্শকে সামনে নিয়ে আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিসএ্যাডভান্টেজড উইমেন (শক্তি ফাউন্ডেশন)-এর যাত্রা শুরু হয়।

ক্ষুদ্রঋণ খাতে যারা প্রথম প্রজন্ম হিসেবে কাজ করতে এসেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সোশ্যাল ভিশনারি। নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। তাঁদের স্বপ্ন ছিল এমন একটি সমাজের যেখানে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো বৈষম্য থাকবে না, যেখানে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। সমাজে থাকবে সবার সমান অধিকার এবং তাঁদের অংশগ্রহণ ও প্রচেষ্টাতেই দেশ পৌঁছে যাবে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে।

লক্ষ্য অর্জনে এ পথচলা মসৃণ না হলেও, তাঁদের অবিরাম প্রচেষ্টায় নারীরা নিজেদের পরিচিতি প্রতিষ্ঠায় অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। অন্যের মা, স্ত্রী, কন্যা বা সহোদরার পরিচিতির বাইরে এসে তাঁরা নিজেদের নামে পরিচিতি পান।

> নারীকে তাঁর যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। শুধুমাত্র ন্যায্য সুযোগই নয়, নারীকে দিতে হবে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা।

এ কাজেরই ধারাবাহিকতায়, দ্বিতীয় প্রজন্মের লিডাররা "নারীর ক্ষমতায়ন" অর্জনের উদ্দেশ্যে নতুন লক্ষ্য নিয়ে যুক্ত হন। তাঁদের যোগদান উন্মোচন করে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। দ্বিতীয় প্রজন্মের লিডাররা কাজ করেছেন নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখেছি নারীদের সকল বাধা ডিঙিয়ে কর্পোরেট দুনিয়া থেকে শুরু করে সাংবাদিকতা, উন্নয়ন সংস্থা, গার্মেন্টস সেক্টরে সব জায়গায় নিজেদের বলিষ্ঠ ছাপ রাখতে।

বর্তমান প্রজন্মের যারা ক্ষুদ্রঋণ খাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদেরও মূল লক্ষ্য "নারীর ক্ষমতায়ন" অর্জন। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির যুগে বিশ্বদরবারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা তৈরি ও তাঁদের উপস্থাপন করতে ক্ষুদ্রঋণ, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা বা প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। এই প্রজন্মের লিডাররা কর্মক্ষেত্রে নারীদের বহির্জগতে আলাদা পরিচয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করছেন।

কিন্তু বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ খাত একটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে "নারীর ক্ষমতায়ন"-এর লক্ষ্য অর্জনে। এখনও আমরা দেখি, সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ভূমিকা রক্ষণশীল। সমাজের দৃষ্টিকোণে, নারীর অবস্থান এখনও ঘরে, তাঁর কর্তব্য গৃহকেন্দ্রিক। ফলে, বহির্জগতে তাঁর কোন স্থান নেই। মা, স্ত্রী, কন্যা ব্যতীত তাঁর যে নিজের আলাদা পরিচিতি রয়েছে, সমাজ তা এখনও মেনে নিতে পারেনি।

এরই প্রতিফলন দেখা যায়, কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ পদোন্নতির সময়। কুসংস্কারে আবদ্ধ পুরনো চিন্তাধারা কোথায় যেন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ নারী-পুরুষকে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞাতেই আটকে ফেলেছে, নির্দিষ্ট কাজেই তাঁদের সীমাবদ্ধ করে রাখছে। কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি, আমাদের সীমানা এখন অসীম।

প্রযুক্তির এই যুগে এসেও নারীর ভূমিকা সমাজে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে একজন নারীকে দেখে সমাজ অভ্যস্ত নয়। কিন্তু, এই চিন্তাধারা থেকে সকলকে বেরিয়ে আসতে হবে। নারীকে তাঁর যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। শুধুমাত্র ন্যায্য সুযোগই নয়, নারীকে দিতে হবে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা।

একই সমস্যা নিয়ে নারী-পুরুষদের মধ্যে যে ভিন্ন উপলব্ধি দেখা যায়, তা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। তাই, আমাদের ভিন্নতাকে বিভেদ নয় বরং শক্তিতে পরিণত করতে হবে।

এই পথচলা আমাদের জন্য সহজ হবে না, তবে তা অর্জন অসম্ভবও নয়। নেতৃত্ব প্রদানকারী অবস্থানে নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে গেলে অফিসের ম্যানেজমেন্টকেও সক্রিয় ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। তা হতে পারে নারীবান্ধব পলিসি তৈরি, কর্মক্ষেত্রে অবস্থানরত নারীকর্মীদের কাজের সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পদোন্নতি অথবা যোগ্য নারীকর্মী খুঁজে নিয়োগ প্রদান। এই সবকিছুর সূচনাই হবে চিন্তাধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে। আশা করছি, এই চিন্তাধারা পরিবর্তনের যাত্রায় বরাবরের মতোই পিকেএসএফ অগ্রজ হয়ে বিভিন্ন যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

দেশ ও জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর যে উন্নয়নধারা, ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকুক এ কামনাই করছি। পিকেএসএফ দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ পরিবারের সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা!

পিকেএসএফ-এর কাছে চিরকৃতজ্ঞ সোপিরেট

অধ্যাপক ড. এম. মোসলেহ্ উদ্দীন
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সোপিরেট

২০২১ সালের ২৫ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ অনুমোদন করে, যার চূড়ান্ত স্বীকৃতি পেতে বাংলাদেশকে ২০২৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ২,৭৮৪ মার্কিন ডলার এবং জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.১২%। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, আমাদের দেশের নাগরিকদের অনেক সুযোগসহ দীর্ঘ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পৌঁছানোর সক্ষমতা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বেসরকারি সংস্থাগুলির সাথে একত্রে ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে সোপিরেটও একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক এবং বেসরকারি সংস্থা হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে।

টেকসই উন্নয়ন, লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক সম্প্রীতির প্রচার ও প্রসারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।

লক্ষ্মীপুর সদর ও রামগঞ্জ উপজেলার ২০টি ইউনিয়নে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৫ সালে 'সোপিরেট'-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৯৯৩ সালে লক্ষ্মীপুর সদর ও রামগঞ্জ উপজেলার দুইটি শাখার মাধ্যমে সংস্থাটি ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৪ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে স্বল্প সার্ভিস চার্জে সংস্থাটিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা নোয়াখালী ও ফেনী জেলায় বর্তমানে সংস্থার ৫৭টি শাখা রয়েছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সাল থেকে 'সোপিরেট' তার বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দেশকে একটি উৎপাদনশীল, সমৃদ্ধ এবং টেকসই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করা, যুবদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, গুজব-কুসংস্কার বিরোধী সভা-সমাবেশ, সামাজিক উদ্যোক্তা এবং সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে দরিদ্র জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করা ইত্যাদি। বর্তমানে সংস্থাটি মোট ৫৭টি উপজেলায় অতিদরিদ্র, দরিদ্র ও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ আয়বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমৃদ্ধি, রেইজ, বিডি রুরাল ওয়াশ, RMTP, সমন্বিত কৃষি ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চলমান রেখেছে।

এছাড়া, জুলাই ২০১৭ থেকে কিশোর-কিশোরীদের জন্য 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড', সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রবীণদের জন্য 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' এবং ২০২০ সাল থেকে

'কৈশোর কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থার মোট সদস্য ৫৪,৮০৯ জন, যার মধ্যে ১,২১৭ জন পুরুষ এবং ৫৩,৫৯২ জন নারী।

'সোপিরেট'-এর সকল সাফল্যের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতির বিনির্মাণ ও শক্তি সঞ্চারে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে পিকেএসএফ 'সোপিরেট'-এর ওপর আস্থা রেখেছে। সে জন্য 'সোপিরেট' পিকেএসএফ-এর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

সংস্থাটি এর কর্মএলাকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। সব ক্ষেত্রে সুশাসন অব্যাহতভাবে প্রতিপালনের বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রতিবছর সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ৭ জনের নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

সৃজনশীলতা উদ্ভাবন এবং অনন্যতার মাধ্যমে 'সোপিরেট' তার কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য নিয়মিত কাজ করছে। ফলশ্রুতিতে, অত্র অঞ্চলে শোষণ ও বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ বাড়বে। 'সোপিরেট' যে লক্ষিত জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে সেবা প্রদান করে আসছে, তাদের কাছে এর পরিষেবাগুলি অত্যন্ত প্রশংসিত। সংস্থাটি টেকসই উন্নয়ন, লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক সম্প্রীতির প্রচার ও প্রসারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংস্থাটি তার দীর্ঘ যাত্রাপথে অনেক মানুষের জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে এবং সকলের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যত তৈরির লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে।

দরিদ্রদের সমন্বিত উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর অবদান অসামান্য

খুরশীদ আলম, পিএইচডি
নির্বাহী পরিচালক
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলবর্তী দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ড্যানিডার 'বোট বিল্ডিং স্কিম' ও 'বোট রেন্টাল স্কিম' প্রকল্পের উত্তরসূরি হিসেবে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক) ১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ছলিমপুর ইউনিয়নের ৭টি জেলে গ্রামে কাজ শুরু করে। কোডেক আজ তার উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ৩৮তম বর্ষে পদার্পণ করেছে।

২০০৭ সালে কোডেক পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে পথচলা শুরু করে। তহবিল সংগ্রহের চেয়ে এই সংস্থা তার কর্মসূচিকে সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে শুরু থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সংস্থাটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কোভিড মহামারি ও বিভিন্ন সংকট মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করেছে। কোডেকে ১৭ বছর ধরে উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করার জন্য আমরা পিকেএসএফ-কে আন্তরিক অভিবাদন জানাই।

> পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থায়ন কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগের ফলে অর্থায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর, গতিশীল ও নিরাপদ করা সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

কোডেক তিন দশকের বেশি সময় ধরে কাজের মাধ্যমে একটি জনঅংশগ্রহণমূলক সংগঠন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এ সংস্থায় প্রায় পাঁচ হাজার উন্নয়ন কর্মী কাজ করছেন, যার মধ্যে ৪০ ভাগই নারী। সংস্থাটি ২০ লক্ষ পরিবারের সাথে কাজ করছে, যার অধিকাংশই অতিদরিদ্র। পাশাপাশি, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, দক্ষতা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ, ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি, বনায়ন ও সরকারের সাথে সমন্বয় করে রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন সেবাসহ বিভিন্ন কর্মপরিধিতে কাজ করছে কোডেক। উক্ত কার্যক্রমসমূহ বাংলাদেশের ৫টি বিভাগ ও ২০টি জেলায় বিস্তৃত।

সংস্থাটি বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলের হতদরিদ্র মানুষের উন্নয়নে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত ক্ষুদ্রঋণের বহুমাত্রিক কর্মসূচির পাশাপাশি সর্বমোট ২১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যার মধ্যে ১১টি প্রকল্পের কাজ বর্তমানে চলমান আছে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও বাসস্থান তৈরির উদ্যোগ এবং লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানির প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পসমূহ এলাকার জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখছে।

কোডেক ক্ষুদ্রঋণের উদ্বৃত্ত তহবিল এবং পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে গরীব, অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাসিক বৃত্তি, উচ্চশিক্ষার জন্য

আর্থিক সহায়তা, শীতার্তদের শীতবস্ত্র বিতরণ, প্রতিবন্ধীদের জন্য এককালীন অর্থ সহায়তা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার, হুইল চেয়ার, সেলাই মেশিন, চিকিৎসা সহায়তা, মডেল মসজিদ নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষায় অগ্রগতি হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং সময় উপযোগী পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সুসংহত করছে।

পিকেএসএফ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের সমন্বিত উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর অসামান্য অবদানের জন্য পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পিকেএসএফ-এর সাথে স্মৃতিময় পথচলার ২৭ বছর

জহিরুল আলম
নির্বাহী পরিচালক
ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৯ সনের ১৩ নভেম্বর পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠা করে। জন্মলগ্ন থেকে পিকেএসএফ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র অর্থায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতাবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পণ্য প্রক্রিয়া ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অনবদ্য অবদান রেখে আসছে।

পর্যায়ক্রমে এ কার্যক্রমগুলোর ব্যাপ্তি দেশব্যাপী সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতার পরিচয় দিয়ে পিকেএসএফ আজ এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। একইসাথে, জনগণের জন্য গৃহীত যেকোনো উদ্যোগ, প্রকল্প বা কর্মসূচি পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে।

> জনগণের জন্য গৃহীত যেকোনো উদ্যোগ, প্রকল্প বা কর্মসূচি পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

দুর্গম ও সুবিধাবঞ্চিত পাহাড়ি এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনের প্রত্যয় নিয়ে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বন্ধু, প্রাক্তন সহকর্মী ও প্রিয় শিক্ষকদের নিয়ে ১৯৯২ সালে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৩ সালে বান্দরবান জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে আইডিএফ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। এলাকার জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে আইডিএফ ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, শিক্ষা, সৌরবিদ্যুৎ, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, উদ্যোক্তাদের জন্য পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ এবং গ্রাহক সুরক্ষাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর সমাধান সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

আইডিএফ ১৯৯৭-৯৮ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে নির্বাচিত হয়। মাত্র এক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর সাথে আইডিএফ-এর যাত্রা শুরু হয়। আইডিএফ-এর রাঙামাটি শাখার আওতাধীন দরিদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে বিতরণের জন্য উক্ত ঋণ মঞ্জুর হলেও হঠাৎ এনজিও ব্যুরো কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে ঋণ বিতরণ সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষিত হওয়ায় রাঙামাটি শাখায় ঐ ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। তখন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনার পরামর্শে চট্টগ্রামের রানীরহাট এলাকায় নতুন শাখা চালু করে ঐ এলাকার গরীব পরিবারের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের জন্য উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়।

পিকেএসএফ-এর সাথে আইডিএফ-এর এই সহযোগিতা ও পথচলার প্রায় ২৭ বছর হলো। প্রথমদিকে, পিকেএসএফ-এর সহযোগিতা শুধুমাত্র ঋণ কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় আইডিএফ ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি অনেকগুলো উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সমৃদ্ধি কর্মসূচি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, কৈশোর কর্মসূচি, রেড চিটাগাং ক্যাটল-এর জাত সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প, নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ প্রকল্প, পার্বত্য এলাকায় প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সমন্বিত খামার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্সভিত্তিক বিপণন বিষয়ক উপ-প্রকল্প, RMTP ও RAISE প্রকল্প, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার অতিদরিদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প প্রভৃতি। সর্বোপরি, এ দীর্ঘ সময়ে পিকেএসএফ-এর সাথে সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে আইডিএফ দারিদ্র্য বিমোচনের একটি টেকসই মডেল প্রণয়ন করতে পেরেছে, যা পৃথিবীর যেকোনো দেশের দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কুড়িগ্রামের দারিদ্র্য বিমোচনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা

বীর মুক্তিযোদ্ধা এস. এম. হারুন অর রশীদ লাল
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, সলিডারিটি

কুড়িগ্রামসহ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নে ১৯৯২ সালের ১৪ জানুয়ারি স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সলিডারিটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সলিডারিটি দেশের সাক্ষরতা কার্যক্রমে অনন্য অবদান রাখার জন্য ১৯৯৮ সালে শ্রেষ্ঠ সংগঠনের স্বীকৃতি অর্জন করে এবং এর জন্য সরকার থেকে জাতীয় সম্মাননাও প্রদান করা হয়।

সলিডারিটি প্রতিষ্ঠার ৩ বছর পর পিকেএসএফ-এর তৎকালীন একজন ব্যবস্থাপক বাংলাদেশের অন্যতম দরিদ্র জনপদ কুড়িগ্রাম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ তারিখে সলিডারিটি-কে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দীর্ঘ ৩২ বছর পিকেএসএফ-এর অনেক অনুষ্ঠানে সলিডারিটি অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে আমরা অনেক অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।

গত তিন দশক ধরে পিকেএসএফ সলিডারিটিকে আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি অ-আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনে একটি আর্থিক শৃঙ্খলাসম্পন্ন, নীতিনিষ্ঠ, স্বচ্ছ, মানবিক, অংশগ্রহণমুখী ও জবাবদিহিতামুলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

গত তিন দশক ধরে পিকেএসএফ সলিডারিটি-কে আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি অ-আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনে একটি আর্থিক শৃঙ্খলাসম্পন্ন, স্বচ্ছ, মানবিক, অংশগ্রহণমুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে রাজধানী ঢাকা ছেড়ে সুদূর কুড়িগ্রাম এসে সলিডারিটি'র কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ-এর সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ। এছাড়া, বর্তমানে পিকেএসএফ-এ কর্মরত অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সলিডারিটি'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।

কুড়িগ্রাম জেলার মঙ্গা মুক্তির জন্য পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে আরডিআরএস, সলিডারিটি-সহ অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে ব্যাপক কর্মতৎপরতা চালানো হয়েছে। পিকেএসএফ-এর বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কুড়িগ্রামের

বিশেষত চরাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সার্বিক পরিস্থিতি জানার জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং কুড়িগ্রামের তথ্য নিয়ে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে অর্থায়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতেন, যা কুড়িগ্রামের মঙ্গা নিরসনে অনন্য অবদান রেখেছে।

সলিডারিটি পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে মাত্র ১৭ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুরি নিয়ে তা থেকে ঘূর্ণায়মান তহবিলের মাধ্যমে ৫০ কোটি টাকা প্রায় সাত হাজার প্রান্তিক মানুষের মধ্যে ঋণ বিতরণ করেছে। এছাড়া, সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, কৃষি, সম্পদ উন্নয়ন ও ভিক্ষুক পুনর্বাসন করা হয়েছে। বর্তমানে এসব পরিবার ভিক্ষার অভিশপ্ত জীবন থেকে বেরিয়ে এসে অন্য পেশায় যুক্ত হয়েছে এবং জীবন-জীবিকার সফল উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবারে মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করছে। ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ছয় হাজারের অধিক পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে। এ সকল পরিবারের সন্তানরা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মানসম্মত শিক্ষা লাভ করেছেন ও কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ঋণ কার্যক্রমে বকেয়া বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি পিকেএসএফ-এর রি-পেমেন্ট অব্যাহত রাখার ফলে সলিডারিটি'র ঋণ কর্মসূচিতে ভালো ফলাফল আনা সম্ভব হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে সলিডারিটি'র ঋণ কর্মসূচিতে নতুন করে গতি আনার জন্য পিকেএসএফ কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। বিভিন্ন কারিগরি সহায়াতার পাশাপাশি পিকেএসএফ সলিডারিটি'কে নানান সময়ে বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিদেশে শিক্ষা সফরে জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দিয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও অসামান্য অবদানের জন্য ২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে ঢাকায় পিকেএসএফ ভবনে আমাকে একটি বরেণ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বিগত ২০২২-২৩ সালে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কুড়িগ্রাম জেলায় কর্মরত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রধান নির্বাহীগণের সাথে কুড়িগ্রামের দারিদ্র্য হ্রাসের কর্মকৌশল নিয়ে এক মতবিনিময় সভা করেন। তাতে সলিডারিটি'র পক্ষে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সুযোগ পাই।

মতবিনিময় সভায় পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক উল্লেখ করেন যে, পিকেএসএফ-এর যেসব সংস্থা ঋণ কার্যক্রমে তেমন ভালো করতে পারেনি, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে যুক্ত করা যেতে পারে। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে সলিডারিটি পুনরায় ২০২৩ সালে পিকেএসএফ পরিচালিত Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমে যুক্ত হয়। ৬০ জন প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীকে কুড়িগ্রামের চরাঞ্চল থেকে সংগঠিত করে সলিডারিটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ল্যাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সলিডারিটি গত তিন দশকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সহায়তায় লক্ষাধিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম সততা ও নিষ্ঠার সাথে পরিচালনা করেছে। এর মধ্যে ফ্লাড প্রুফিং প্রকল্প, সৌহার্দ্য, মঙ্গা নিরসন এবং সিএলপি কর্মসূচি অন্যতম।

বাংলাদেশের অন্যতম অনগ্রসর জেলা কুড়িগ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। তাই একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে ব্যাপক আর্থিক ও অ-আর্থিক দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা জরুরি।

উন্নয়নের সারথি পিকেএসএফ

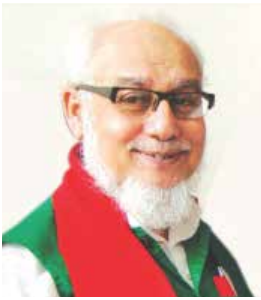

এএইচএম নোমান
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, ডর্প

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অভিনন্দন। পিকেএসএফ-এর জন্মলগ্ন থেকেই এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সবসময় মধুর।

ডর্প ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংস্থাটি উন্নয়ন ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি মূলত দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক কারণ অনুসন্ধান করে তার সমাধানে কাজ করছে।

ডর্প ২০০৩ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। যমুনা বহুমুখী সেতুর উভয় পাশে ৫ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে পিকেএসএফ ডর্প-এর মাধ্যমে ১.৪০ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করে।

> পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার আমাদের সম্মিলিত স্বপ্ন সার্থক হোক।

আমরা পিকেএসএফ-এর সহায়তায়, সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা, পায়রা বন্দরে ৪,২০০ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ৬ জেলায় ঋণ কার্যক্রম প্রচালনা করছি। বর্তমানে ডর্পের ঋণ কার্যক্রমের সদস্য সংখ্য ১০,৪৭৩, সঞ্চয় স্থিতি ৬.৭৭ কোটি টাকা, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৬,৯৬৬ এবং ঋণ স্থিতি ২২.৯২ কোটি টাকা। পিকেএসএফ-এর নিরন্তর সহযোগিতায় 'গ্রীন ডর্প' নাম নিয়ে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত বিচ্ছিন্ন এলাকাকে গুছিয়ে সুষ্ঠুভাবে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করছি। মনিটরিং ও তহবিল সংকটের চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে ডর্প বর্তমানে গতিশীল ঋণ কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

ডর্প-এর কাজের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন অনেকেই। তেমনি একজন শাহজাতপুরের জেসমিন খাতুন। তিনি বলেন, "আমার দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে অনেকেই আমাকে ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু ডর্প আমার পাশে দাঁড়ায়। ডর্প-এর সহায়তায় আমি এখন একজন সফল বেকারি উদ্যোক্তা। বর্তমানে আমার বেকারিতে ৭ জন কাজ করেন। সকল ব্যয় নির্বাহ করে এখন আমার মাসিক আয় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। আমার সন্তানরা লেখাপড়া করছে। আমি তাদের জন্য সঞ্চয়ও করতে পারছি। এজন্য আমি ডর্প ও পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ জানাই।"

জেসমিনের মতো এমন অসংখ্য নারীর ভাগ্য উন্নয়নের সারথি হতে পেরে আমরা গর্বিত। এ সাফল্যের অংশীদার হিসেবে পিকেএসএফ-এর নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা ছিল। পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার আমাদের সম্মিলিত স্বপ্ন সার্থক হোক। এ স্বপ্নযাত্রায় ডর্প পিকেএসএফ-এর চলমান কাজকে প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে নিরলস কাজ করে যাবে।

সরকারি সহায়তায় দারিদ্র্য বিমোচন এবং পিকেএসএফ -এর আগামীর পথচলা

ড. একেএম নুরুজ্জামান
মহাব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন), পিকেএসএফ

পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার পেছনে সরকারের কী উদ্দেশ্য ছিল? পিকেএসএফ কী ধরনের প্রতিষ্ঠান – সরকারি, প্রাইভেট, কোম্পানি, নাকি এনজিও? বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারায় পিকেএসএফ-এর ভূমিকা কী? আমাদের সব সময় এমন নানা ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করেন, সরকারি কর্মকর্তাগণ প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে পর্যালোচনা করতে হবে বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রার ধরন। সম্ভবত বাংলাদেশ বিশ্বে একটি অনন্য উদাহরণ, যেখানে দেশের উন্নয়নে অনেক বেশি সম্পৃক্ত থেকে পাবলিক এবং সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন একসাথে কাজ করে। বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন-কে এনজিও নামে সবাই চেনে। বর্তমান বাস্তবতায় বৃহত্তর প্রশ্ন হচ্ছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অব্যাহতভাবে যৌক্তিকভাবে সম্পদ যোগানে সরকারের ভূমিকা কী হবে? এটি হয়তো অনেকেই জানি, দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ সরকারের পক্ষে এনজিওদের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে নানাবিধ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পিকেএসএফ বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ সম্ভাব্য প্রকল্পের বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে প্রাথমিক আলোচনা করে এবং উভয়ের সম্মতি ও আগ্রহের ভিত্তিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তরসমূহকে সম্পৃক্ত করে প্রকল্পের ধারণাপত্র চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীকালে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সরকার এবং সরকারের সাথে পিকেএসএফ-এর একটি ত্রি-পাক্ষিক চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সাধারণত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে পিকেএসএফ দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বিবেচনায় রেখে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ সকল প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলত সরকার উন্নয়ন সহযোগীর সাথে চুক্তি করে এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব পিকেএসএফ পালন করে। সে লক্ষ্যে সরকারের সাথে পিকেএসএফ-এর চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফলে উন্নয়ন সহযোগীদেরকে ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান এবং সেক্ষেত্রে পিকেএসএফ হতে সরকার এবং সরকার হতে উন্নয়ন সহযোগীদের প্রদেয় সুদের হার নির্ধারণ করা থাকে। চুক্তির প্রধান পক্ষ হিসেবে কোন উন্নয়ন সহযোগীর সাথে কোন মুদ্রায় এবং কোন হারে ঋণ পরিশোধ করা হবে, তা সরকার তত্ত্বাবধান করে এবং পিকেএসএফ সরকার নির্ধারিত হারে সুদসহ আসল দেশীয় মুদ্রায় সরকারকে পরিশোধ করে।

অতীতে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক হতে সাধারণত সরকারের সাথে ০.৫০-০.৭৫ শতাংশ হারে ১০ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ৪০ বছর মেয়াদি তহবিল পাওয়া যেত। বর্তমানে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে বেশি দরে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী হতে সরকারের সুদের

হার বৃদ্ধি এবং সাম্প্রতিক সময়ে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়ায় সরকার এ ধরনের ঋণ গ্রহণ করে পূর্বের হারে পিকেএসএফ-কে ঋণ প্রদানে আগ্রহী হচ্ছে না এবং সাম্প্রতিক কিছু প্রকল্পে সরকার হতে পিকেএসএফ পর্যায়ে অতীতের তুলনায় বেশি হারে সুদ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে, পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে রেয়াতি হারে অর্থায়ন করা প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে, সহযোগী সংস্থার তহবিল-ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উপকারভোগী পর্যায়ে সার্ভিস চার্জ কমানো সম্ভব হচ্ছে না। উপরন্তু, বিদ্যমান সার্ভিস চাজ বজায় রাখা কঠিন হচ্ছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুদের হার সহনীয় রাখতে সরকার থেকে পিকেএসএফ, পিকেএসএফ হতে সহযোগী এনজিও পর্যায়ে রেয়াতি হারে অর্থায়ন প্রয়োজন। এনজিওদের সুদের হার নিয়ে চলমান বিতর্ক সত্ত্বেও এমআরএ'র মাধ্যমে সরকারই এ হার নির্ধারণ করে এবং সময়ে সময়ে পরিমার্জন করে। এমতাবস্থায়, সরকার হতে পিকেএসএফ-এর জন্য একটি যৌক্তিক সার্ভিস চাজ নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যার ভিত্তিতে রেয়াতি হারে এনজিওদের অর্থায়নের মাধ্যমে সদস্য পর্যায়ে সার্ভিস চার্জ সহনীয় মাত্রায় অব্যাহত রাখা যায়। বাংলাদেশ শতাংশ হারে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করলেও বর্তমানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। সরকারের পরিপূরক ভূমিকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যে সকল অংশে সরকারি সেবার অভিগম্যতায় জটিলতা রয়েছে, সে সকল জনগোষ্ঠীকে অভীষ্ট করে পিকেএসএফ কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজি গঠন ও অর্থ সঞ্চালনায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে বিস্তৃত এ কর্মকাণ্ডকে শুধুমাত্র আর্থিক সূচকে মূল্যায়নের সুযোগ নেই, কেননা অর্থায়নের মাধ্যমে জনগণের আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি বর্ধিত আর্থিক সক্ষমতা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির অন্যান্য সকল সূচকে ইতিবাচক প্রবাহ তৈরি করে। এছাড়া, অর্থায়নের পাশিপাশি দারিদ্র্যের বহুমুখী অভিঘাত মোকাবিলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সচেতনতা, প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও সামাজিক পুঁজি গঠনের জন্য সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অভিঘাত সহনশীলতা এবং অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে পিকেএসএফ। উল্লেখ্য, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এবং অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড-এর বাংলাদেশে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ।

কালেক্টিভ এজেন্সি হিসেবে বর্ণিত কার্যক্রম সরকারের দায়িত্ব এবং সরকার প্রতিষ্ঠিত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের পরিপূরক হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ সরকারের সহায়তায় এ লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ পথ-পরিক্রমায় নানাবিধ নীতি সহায়তা ও আর্থিক সহায়তা সরকার অব্যাহতভাবে প্রদান করে চলেছে। এ বাস্তবতায় উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ, সে ঋণের হার নির্ধারণ প্রভৃতি সরকারের সামষ্টিক অর্থনীতির সিদ্ধান্ত এবং এক্ষেত্রে পিকেএসএফ সরকারেরই একটি অংশ। এমন বাস্তবতায়, সরকার হতে উন্নয়ন সহযোগীদের সুদের হার আলোচনার ভিত্তিতে যাই নির্ধারিত হোক না কেন, প্রান্তিক সদস্যদের কল্যাণ এবং এনজিওদের মাধ্যমে ব্যষ্টিক অর্থায়নের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতিতে যে বৃহত্তর প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক সূচকে যে অর্জন হয় তা বিবেচনায় নিয়ে সরকার হতে পিকেএসএফ-কে নমনীয় হারে অর্থায়ন করার বিষয়টি অব্যাহত রাখা যৌক্তিক মর্মে সরকার বিবেচনা করবে বলে পিকেএসএফ প্রত্যাশা করে। উল্লেখ্য, সরকারের বার্ষিক বাজেট হতে পিকেএসএফ-কে পরিচালনা বাবদ কোনো অর্থ বরাদ্দ প্রদান করতে হয় না; পিকেএসএফ নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে তার পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি পিকেএসএফ উন্নয়ন সহযোগী হতে সরকার গৃহীত সকল ঋণ বিধি মোতাবেক যথাসময়ে পরিশোধ করেছে এবং সকল প্রকল্প যথাসময়ে অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সরকারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করেছে।

পিকেএসএফ: টেকসই উন্নয়নের দিশারি

আবুল কালাম আজাদ
সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য নিরসনের ব্রত নিয়ে ১৯৮৯ সালের ১৩ নভেম্বর সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনক্রমে ১ মে ১৯৯০ হতে পিকেএসএফ তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। দু'শতাধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের প্রায় দুই কোটি খানার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে পিকেএসএফ। পাশাপাশি, দেশের পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও বহুমুখী সেবা সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘ ৩৪ বছরে পিকেএসএফ তার প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা ও সক্ষমতাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ফলে, আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে বহুমুখী দারিদ্র্য নিরসনকল্পে সরকারের পরিপূরক সংগঠন হিসেবে পিকেএসএফ এখন দেশে-বিদেশে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

চাকুরির ধারাবাহিকতায় একটি non-transferable job হিসেবে পিকেএসএফ আমার মতো অনেককেই সম্মোহিত করেছে। অনুকূল পরিবেশ, অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পরিপাটি বিন্যাস তুলনামূলকভাবে উপযোগী কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। অফিস সময়ের পরে কর্মস্থলে অবস্থান করে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনকে নিরুৎসাহিতকরণ অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক বাজার দরের সাপেক্ষে বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার তুলনামূলক বিশ্লেষণে পিকেএসএফ চাকুরি প্রত্যাশীদের নিকট এখনও ঈর্ষণীয়। চাকুরেদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, গোষ্ঠী বীমা, গৃহ ঋণ, যানবাহন ঋণ, ল্যাপটপ ঋণ, চিকিৎসা ভাতা, শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্তকরণসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা সংস্থান করে পিকেএসএফ জব মার্কেটে অনন্যতার পরিচয় বহন করছে। চৌকস কর্মীবাহিনী তৈরির কৌশল হিসেবে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণের চাহিদা নিরিখে উন্মুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করে চাকুরেদের পেশাগত দক্ষতা, নৈপুণ্য, উৎকর্ষ ও উৎপাদনশীলতার মানোন্নয়নে সুযোগ প্রদান করছে, যা অনেকের নিকট আকর্ষণীয়। দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিসিপ্লিন হতে উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে একটি স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করায় একটি মাল্টি-ডিসিপ্লিন-বেইজড দক্ষ ও চৌকস জনবলের সমাহার করেছে পিকেএসএফ, যা একটি বহুমাত্রিক নলেজ হাব হিসেবে কাজ করছে। ফলে সেক্টোরাল অভিজ্ঞতা অফিসারদেরকে শাণিত ও প্রতিদ্বন্দ্বী করে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়ক হয়েছে। ব্যবহারযোগ্য তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর অভ্যন্তরীণ কর্ম-পরিবেশকে পর্যায়ক্রমে আধুনিকায়ন করায় সময় ও শ্রম হ্রাস পাচ্ছে, যা কাজের স্বচ্ছতা ও উৎপাদনশীলতাকে ত্বরান্বিত করছে। নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সরকার ও রেগুলেটরি এজেন্সির আইন ও বিধিবিধান পরিপালন এবং সুশাসন ও উত্তম চর্চার বিকাশ ঘটিয়ে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও দৃশ্যমান জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, পিকেএসএফ তার

প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা বজায় রেখে প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশ-বিদেশে অনন্য উদাহরণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

অতিদরিদ্র ও মধ্যম পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা ও চাহিদাতাড়িত প্রশিক্ষণ প্রদানে পিকেএসএফ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। উদ্যোক্তা উন্নয়ন, উদ্যোগসমূহের ক্লাস্টার এবং Resource-Efficient Clean Production (RECP) এ্যাপ্রোচসহ প্রযুক্তিভিত্তিক সম্প্রসারণের মাধ্যমে পণ্যের বৈচিত্র্যায়ন, আর্থিক বাজার সম্প্রসারণ ও জাতীয় উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পিকেএসএফ তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। লাগসই প্রযুক্তি ও কারিগরি সেবা সম্প্রসারণ করে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ পর্যায়ক্রমে তার কাজের ব্যাপ্তি সম্প্রসারণ করছে। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য নিরসনে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সেবার পাশাপাশি নানাবিধ অ-আর্থিক কর্মসূচি (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন) বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের কৈশোর, যুবক, প্রবীণ, কৃষকসহ পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদাতাড়িত জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পিকেএসএফ তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের চাহিদাতাড়িত বিষয়ে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ বছরব্যাপী বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি সক্ষমতা উন্নয়নে 'প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ঋণ' সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার উদ্যমী ও সৃজনশীল উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে উৎপাদিত বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় পণ্য এবং সেবাকে একই ছাদের নিচে একত্রিত করে দেশি ও বিদেশি দর্শক, ক্রেতা, শুভানুধ্যায়ী ও নীতি নির্ধারকদের নিকট তুলে ধরার অভিপ্রায়ে নিয়মিতভাবে 'উন্নয়ন মেলা' আয়োজন করে তার ব্যবস্থাপনিক সক্ষমতা ও নেটওয়ার্ককে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে কাজ করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেশন অর্জন এবং অ্যাডাপটেশন ফান্ডসহ গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর অর্থায়নে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের সফলতায় পিকেএসএফ-এর সুখ্যাতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নসহ পিকেএসএফ তার মূলস্রোত ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সরকারের নানাবিধ কর্মসূচির গুণগতমান বজায় রেখে তা বাস্তবায়নে পরিপূরক হিসেবে কাজ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকলের নিকট অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

সময়ের বাস্তবতা বিবেচনায় প্রয়োজন হচ্ছে উৎপাদনশীল চিন্তার আলোকে উপযুক্ত ও অর্জনযোগ্য যুগোপযোগী একটি কৌশলগত পরিকল্পনার। পিকেএসএফ-এর প্রাতিষ্ঠানিক পারঙ্গমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দেশ-বিদেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বহুমুখী সেবাপ্রদানে উপযুক্ত, অনন্য ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল অনুষঙ্গের সম্মিলন করা দরকার। কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিকে আরো শাণিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামো, চৌকস জনবল ব্যবস্থাপনার বিন্যাস, দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, সময়োপযোগী ও অভিযোজনশীল উপযোগী আর্থিক সেবা কর্মসূচি, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কৌশলের নিরিখে অতিদরিদ্র, উদ্যোক্তা ও এসএমই উন্নয়ন, কৃষি, পরিবেশ ও জলবায়ু এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অভিযোজনশীল কর্মসূচি বাস্তবায়ন, বিস্তর গবেষণা, উদ্ভাবনী অভিনিবেশ, ডিজিটালাইজেশন, Strategic Alliance and Institutional Development, Policy Research & Advocacy, আধুনিক যোগাযোগ ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ইস্যুতে কাজের বিস্তর সুযোগ এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোটা অতীব জরুরি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্ভাবনী চিন্তার ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন আগামী চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় পিকেএসএফ-কে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিনির্মাণে সহায়ক হবে।

পিকেএসএফ-এ যোগদান: জীবনের নতুন অধ্যায়

মোঃ রায়হান মোস্তাক
ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

মঙ্গলবার, ১৬ জুলাই ২০১৯, আমার জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে, যখন আমি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এ ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) পদে যোগদান করি। ৩০ মে ২০১৯ তারিখে আমি পিকেএসএফ ভবনে প্রথমবার পদার্পণ করি ব্যবস্থাপক পদে লিখিত পরীক্ষার জন্য। প্রথমদিন থেকেই ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভবনের সামনের সুবিস্তৃত সিঁড়ি এবং ফুলের টবের সাজসজ্জা আমাকে মুগ্ধ করে। এ অভিজ্ঞতা আমার মনে বিশেষ এক জায়গা দখল করে নেয়।

পিকেএসএফ-এ যোগদানের অফার লেটারের স্ক্যান কপি যখন ইমেইলে পাই, আমি তখন ফ্রান্সভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা অ্যাকশন এগেইনস্ট হাঙ্গার (এসিএফ)-এর অর্থায়নে 'ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টমিন্সটার'-এ একটি শর্ট অ্যাকাডেমিক কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য লন্ডনে ছিলাম। এ বিষয়ে আমার এসিএফ-এর সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যেখানে উল্লেখ ছিল যে দেশে ফিরে আসার পর অন্তত দুই বছর আমি চাকরি ছাড়তে পারবো না। এ চুক্তির কারণে কিছু আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও, আমি পিকেএসএফ-এ যোগদানের সিদ্ধান্ত নেই। সিদ্ধান্তটি আমার জীবনে একটি নতুন মোড় এনে দেয় এবং আমি বিশ্বাস করি যে এটি আমার জীবনে অত্যন্ত ইতিবাচক একটি পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন, যা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং পেশাগতভাবে উন্নত করতে সাহায্য করছে। কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব, সহযোগিতা, প্রাত্যহিক কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং প্রতিটি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন পিকেএসএফ-এ আমার কাজের অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করছে। পাশাপাশি, পিকেএসএফ আমাকে দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করে তাদের জন্য কার্যকরী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুযোগ মিলছে পিকেএসএফ-এ। দেশের অনগ্রসর মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করতে পেরে আমি আনন্দিত।

কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা বজায় রেখে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করা হয় পিকেএসএফ-এ। এখানে কাজ করার মাধ্যমে আমি শিখেছি কীভাবে প্রকল্প পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তার সফল বাস্তবায়ন করা যায়। এছাড়া, পিকেএসএফ-এ বহুমাত্রিক কাজের মাধ্যমে আমার পেশাদার জীবনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, টেকসই উন্নয়ন এবং পিকেএসএফ

ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম
ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়ের তুলনায় চিকিৎসা ব্যয় অনেক বেশি। চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১.১৪ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায় (WHO, ২০১৯)। স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যয় হয় ৬৯ শতাংশ, যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ব্যয় বেশি হওয়ায় প্রায় ৩ কোটি মানুষ প্রয়োজন হলেও চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে যায় না (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০২১)। 'সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা' অর্জনে বাংলাদেশের প্রধান অন্তরায় হলো উচ্চমাত্রায় ব্যক্তির নিজস্ব ব্যয় বা 'আউট অব পকেট এক্সপেন্ডিচার'। ধনী-দরিদ্র এবং গ্রাম-শহরে স্বাস্থ্য সূচকে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। একটি দেশ কতটুকু উন্নতি করেছে তা যে সকল সূচক দিয়ে পরিমাপ করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো দেশের মানুষের স্বাস্থ্য চিত্র। স্বাধীনতা-উত্তর ৫০ বছরে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সরকার তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকসহ বিভিন্ন পর্যায়ে হাসপাতাল স্থাপন করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। এরপরও প্রতিবছর বাংলাদেশের প্রায় ৭ লাখ মানুষ চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন্য বিদেশে যায় এবং এর ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। ১৯৯০ সালে প্রতি ১০টি মৃত্যুর মধ্যে মাত্র ৩টি মৃত্যুর কারণ ছিল অসংক্রামক রোগ এবং বাকি ৭টি মৃত্যুর কারণ ছিল সংক্রামক রোগ। আর দুই দশক পর বর্তমানে প্রতি ১০টি মৃত্যুর মধ্যে ৭টি হচ্ছে অসংক্রামক রোগের কারণে (WHO, ২০১৮)। দেশে প্রতিবছর স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগে কয়েক লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। অপুষ্টি, ঘনবসতি, দুর্বল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিবেশ প্রভৃতি কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী রোগব্যাধিতে বেশি আক্রান্ত হয় এবং চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য আর্থিকভাবে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পিকেএসএফ দেশের ৬৪ জেলার প্রায় ২ কোটি সদস্যকে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করছে। পিকেএসএফ-এর সদস্যদের প্রায় ৯২ শতাংশই নারী। আমার পিএইচডি গবেষণায় পেয়েছি, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের গর্ভবতী নারীরা লবণাক্ত পানি গ্রহণের কারণে উচ্চ রক্তচাপসহ বিভিন্ন ধরনের প্রজনন সংক্রান্ত রোগে ভুগে। গর্ভধারণ কোনো অসুস্থতা না হলেও প্রতি লাখে ১৫৬ জন মা মৃত্যুবরণ করেন এবং বিপুল সংখ্যক নারী গর্ভজনিত জটিলতা ফিস্টুলাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগে। মোট কথা, একজন নারীকে মাতৃত্বজনিত কারণে দৈহিক, মানসিক এবং আর্থিক চ্যালেঞ্জসহ মৃত্যুকেও মেনে নিতে হয়। অথচ সঠিক সময়ে যথাযথ চিকিৎসাসেবা নিলে মাতৃমৃত্যু ও রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব। মাঠপর্যায়ে দেখেছি, দরিদ্র পরিবারগুলো গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বিক্রি করে, অলংকার বন্ধক রেখে, উচ্চ সুদে প্রতিবেশীর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসবজনিত ব্যয় নির্বাহ করে। রোগব্যাধি এবং মাতৃত্বকালীন চিকিৎসা ব্যয়ের কারণে

পরিবারগুলো দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে পারে না। তাই টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দরিদ্র পরিবারসমূহের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি নিয়ে আমার কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু এবং স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তির ব্যয় জাতীয় পর্যায়ের চেয়ে কম। এ পরিপ্রেক্ষিতে, অনেক সহযোগী সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জলবায়ু পরিবর্তন, অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তির উচ্চ ব্যয় প্রভৃতি প্রেক্ষিত বিবেচনায় ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি একটি প্রতিরোধমূলক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো খুবই প্রয়োজন, যেখানে সকল সদস্য ও তার পরিবারের স্বাস্থ্য তথ্য থাকবে। এটি সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রতিবন্ধীবান্ধব ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ এবং আমার অভিজ্ঞতা

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
উপ-ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

প্রশিক্ষণ জগতে চূড়ান্ত বলে কিছু নেই। প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র প্রয়োজনে সৃষ্ট কোনো ক্রিয়া, যা প্রকৃষ্টরূপে পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে এক সহায়ক অনুষঙ্গ। আমাদের বদলে যেতে থাকা কর্মপরিসর, অভিজ্ঞতার জগৎ, সমাজ ও সংস্কৃতির সাপেক্ষে প্রশিক্ষণের চেহারা ও ধরন বদলাতে থাকে। কাজেই এমন কোনো অভিন্ন প্রশিক্ষণ নেই, যা প্রশিক্ষণবিদদের এক কাতারে নিয়ে আসতে পারে। মনন-চিন্তা-জ্ঞান-দক্ষতা ও আচরণগত প্রলেপে মোড়ানো থাকে প্রশিক্ষণ কলেবর। বিশ্বব্যাপী পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে এবং কর্মসংস্থান সৃজনে প্রশিক্ষণ যে এক পরীক্ষিত কৌশল তা আজ অস্বীকার করার কোনো জো নেই। এমন বাস্তবতায় দেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) শুরু থেকেই প্রশিক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

পিকেএসএফ-এ ২০১৪ সাল থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পভুক্ত কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী সদস্যদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। প্রকল্পের শুরুতে আমরা প্রচলিত প্রশিক্ষণ (কোনো সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী সদস্যদের অবস্থান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ) ধারায় কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (নারী ও পুরষ) বিভিন্ন ধরনের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের চেষ্টা করে আসছিলাম। কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে এনে তাদের দীর্ঘ মেয়াদি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রশিক্ষণ চলাকালীন ঝরে পড়ার হার সবচেয়ে বেশি। এ কারণে প্রকল্প হতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ও সময় ব্যয় করেও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণের আওতায় অর্ন্তভুক্তকরণ সম্ভব হচ্ছিল না। এমন বাস্তবতায় পরবর্তীতে আমরা 'প্রতিবন্ধীবান্ধব ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ মডেল' প্রয়োগ করি, যা ছিল কার্যকর এবং ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আসবেন না বরং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাছে গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ মডেলের মূল ধারণা ছিল প্রশিক্ষণ আয়োজক সংস্থা ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ গাড়ির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ ও রিসোর্স নিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দোরগোড়ায় যাবে।

সাধারণত যে স্থানে ১০ থেকে ১২ জন কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পাওয়া যাবে, সেখানে প্রশিক্ষণ উপযোগী একটি ঘর বা অস্থায়ীভাবে তাঁবু টানিয়ে বা গাছের ছায়ায় প্রশিক্ষণ ভেন্যু তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ মডেল বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা যায় যে, প্রচলিত ধারায় প্রশিক্ষণের চেয়ে এ মডেলে অল্প বাজেটে অধিক সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব। পরবর্তী সময়ে "প্রতিবন্ধীবান্ধব ভ্রাম্যমাণ মডেল" ধারণাটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ ২০১৭-২০১৮-এ "প্রতিবন্ধীবান্ধব ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ: নাগরিক সেবায় পিকেএসএফ-এর নবতর উদ্যোগ" শিরোনামে ৮৫-৯০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী,

দেশে ৬৬ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এখনও কোনো কাজের সাথে যুক্ত হতে পারেননি। যারা কাজ পেয়েছেন, তাদের মধ্যে সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মাত্র ২.৫০ শতাংশ কর্মরত রয়েছেন।

বিবিএস-এর তথ্য মোতাবেক, ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী যেসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত, তাদের অধিকাংশই স্ব-কর্মে নিয়োজিত। এ হার ৫৪.৪২ শতাংশ। একইভাবে নিজেদের গৃহস্থালি বা পারিবারিক ব্যবসায় যুক্ত রয়েছেন ১৮.১৪ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন ১৬.৩৭ শতাংশ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও)-তে কাজ করছেন ০.৬৮ শতাংশ, স্থানীয় সরকার অথবা সরকারের প্রকল্পে কাজ করছেন ০.৬৩ শতাংশ এবং সরকারি অথবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন ২.৫০ শতাংশ। বিভাগভিত্তিক হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি কাজ করছে রংপুরের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। বিভাগটিতে এ হার ৪.৫৮ শতাংশ। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে বরিশালে ৪ শতাংশ, চট্টগ্রামে ১ শতাংশ, ঢাকায় ৩ শতাংশ, খুলনায় ২ শতাংশ, ময়মনসিংহে ২.৪২ শতাংশ ও রাজশাহীতে ৩ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। সিলেটে এ হার শূন্য।

দেশের সরকারি-বেসরকারি কিংবা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃজনে পিকেএসএফ-এর প্রতিবন্ধীবান্ধব ভ্রাম্যমাণ মডেলটি দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করতে পারলে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

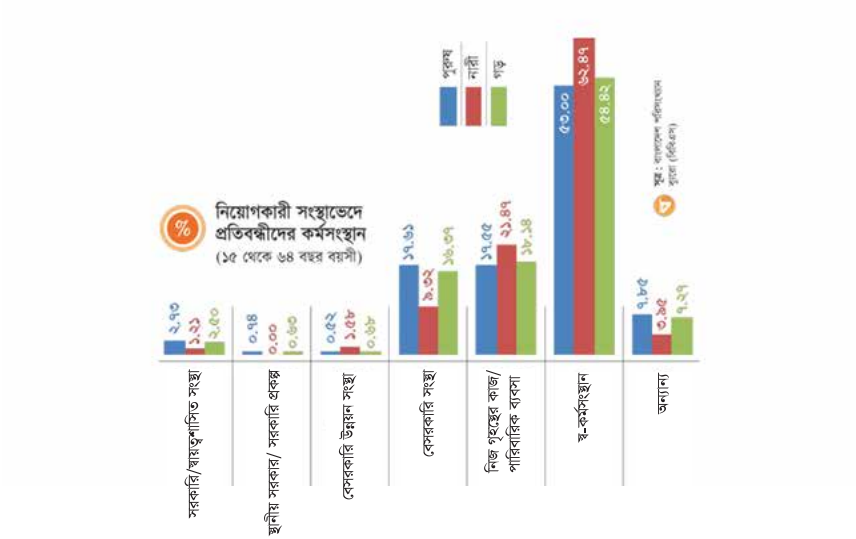

প্রাণের পিকেএসএফ-এ অর্ধ যুগ

মেহেদী হাসান ওসমান
উপ-ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাৎস্যবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে বিগত ০১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে সহকারী ব্যবস্থাপক হিসেবে পিকেএসএফ-এ আমার কর্মজীবন শুরু। পিকেএসএফ-এ যোগদানের পর আমার পদায়ন হয় সমন্বিত কৃষি ইউনিট-এ। মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সদস্যদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে পিকেএসএফ।

দাপ্তরিক কাজে সিনিয়র-জুনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সকলের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা, অফিসের প্রতি ফ্লোরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্ম পরিবেশ, কর্মকর্তাদের মার্জিত পোশাক, মানসম্মত দুপুরের খাবার সরবরাহ ইত্যাদি নানা কারণ পিকেএসএফ একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে স্থান করে নিয়েছে।

পিকেএসএফ-এ চাকরি সুবাদে বিভিন্ন ধরনের দাপ্তরিক কার্যক্রমে দেশের অভ্যন্তরে মাঠ পরিদর্শন এবং দেশের বাহিরে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা অর্জন আমাকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করেছে। পিকেএসএফ-এ যোগদানের পর ২২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ সর্বপ্রথম খুলনা জেলা ও পরবর্তীতে কুমিল্লা জেলায় মাঠ পরিদর্শনে যাই। বিগত ছয় বছরে সমন্বিত কৃষি ইউনিট ও অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ২৫টি জেলার ৩০টি সহযোগী সংস্থা পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বিগত ১৯-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে থাইল্যান্ডের Asian Intitute of Technology (AIT)-তে 'Project Management with an Emphasis on Agricultural and Rural Development Projects' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল।

২০১৯ সালে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলা এবং ২০২২ সালে পিকেএসএফ দিবস উপলক্ষ্যে পুরস্কার ও সম্মাননা বিতরণ সংক্রান্ত উপ-কমিটিতে কাজ করার মাধ্যমে নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। সময়ের পরিক্রমায় পিকেএসএফ-এ ছয় বছর পার হয়ে গেলো। আশা করি চাকরি জীবনের বাকি সময়টুকুও প্রাণের পিকেএসএফ-এ অতিবাহিত করতে পারবো।

প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের অংশীজন

মোঃ শামসুজ্জোহা
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক
ঊষা, সাতক্ষীরা

১৯৯৪ সালের কথা। সাতক্ষীরা নৈশ কলেজে রসায়ন বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদানের উদ্দেশ্যে যশোর থেকে সাতক্ষীরায় থিতু হয়েছি। আমি তখন সদ্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাশ করা টগবগে একজন যুবক। সারাদিন তেমন কোনো ব্যস্ততা নেই। সন্ধ্যার পরে কখনও একটা ক্লাস থাকে, কখনও থাকে না। এমন কর্মহীন যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে কিছু একটা করার জন্য মনে মনে ছটফট করছিলাম। এমন সময় আমার এক নিকট আত্মীয়ের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে তারই বাড়ির একটি কক্ষে বিনা ভাড়ায় শুরু হয় 'ঊষা'র যাত্রা। প্রথম দিকে গ্রামের নারীদের সংগঠিত করে হস্তশিল্প শেখানোর মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে যে লাভ হতো সেখান থেকে প্রতি সপ্তাহে মাত্র দুই টাকা সঞ্চয় করে যখন পাঁচ হাজার টাকা পুঁজি জমা হয়, তখন সেই টাকা দিয়ে ১৯৯৯ সালে প্রথম এক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সূচনা হয়।

দেশের প্রান্তিক মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে, তা বাস্তবায়নে ঊষা পিকেএসএফ-এর বিশাল কর্মযজ্ঞের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আবেদন করে। পরবর্তীকালে, পিকেএসএফ-এর আকস্মিক পরিদর্শনে সংস্থার হিসাব বিভাগের পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি (নন অটোমেশন এবং রিপোর্টিং সিস্টেম) পরিলক্ষিত হয় এবং তা সঠিকভাবে যাচাই সাপেক্ষে সকল ক্ষেত্রে সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। একাধিক পরিদর্শন পরবর্তী সংস্থার সমন্বিত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা, মাঠ এবং অফিস পর্যায়ে এক ও অভিন্ন ডেটা অন্তর্ভুক্তি এবং হালনাগাদকরণ, এবং পিকেএসএফ-এর চাহিদা ও শর্ত পূরণ করার পর গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে ঊষা অন্তর্ভুক্ত হয়। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্তির পর সংস্থার তহবিল বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, নির্ভুল প্রতিবেদন তৈরি এবং বিভিন্ন অংশীজনের আস্থা ও সহযোগিতা সংস্থার কাজকে আরো বেগবান করে তুলেছে।

সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সুন্দরবন ঘেঁষা সাতক্ষীরা জেলার মানুষ অত্যন্ত সহজ সরল প্রকৃতির। এখানকার কৃষকেরা ছয় মাস অন্যের জমি বর্গা চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই বর্গাচাষীরা সুদখোর মহাজনদের নিকট থেকে টাকা ধার করে শেষ পর্যন্ত নিজের ভিটেমাটি হারিয়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মসংস্থানের জন্য ছড়িয়ে পড়ে। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় অনেকে আবার দুষ্ট লোকদের হাতিয়ার হয়ে বনদস্যু অথবা জলদস্যুদের খাতায় নাম লেখায়। কেউ কেউ আবার চোরাইপথে প্রতিবেশী দেশ ভারতে ছুটে যায় কাজের সন্ধানে। এসব ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছে অনেক চোরাকারবারি সিন্ডিকেট। তারা দেশ থেকে মূল্যবান সম্পদ যেমন স্বর্ণ, চিংড়ি, কাঁকড়া,

ইলিশসহ নানা ধরনের জিনিস ভারতে পাচার করে এবং ভারত থেকে নানা ধরনের নেশাদ্রব্য বাংলাদেশে পাচার করে। এমনকি চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে অনেক অসহায় কিশোরীকে পাচার করা হয় ভারতের বিভিন্ন শহরে। এসব পরিস্থিতি দেখে আমি অনুধাবন করলাম যে, এই অঞ্চলের মানুষদের যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তাহলে অবৈধ অভিবাসনসহ অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এভাবে একে একে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকে ঊষা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হওয়ায় সাতক্ষীরা জেলার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় জলবায়ু-সহিষ্ণু কার্যক্রম যেমন মৎস্য চাষ, লবণাক্ততা-সহিষ্ণু কৃষিকাজের সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর সাথে ঊষা নিবিড়ভাবে কাজ করতে আগ্রহী।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে আমরা গর্বিত। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ঊষা হবে আগামী ভোরের সোনালি সূর্য।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তৈরিতে পিকেএসএফ-এর অবদান অনন্য, অমূল্য

এডভিন বরুণ ব্যানার্জী
নির্বাহী পরিচালক, পিদিম ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশের শহর এবং গ্রামীণ জনপদে যে সকল পেশাজীবী মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে, তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীরা অন্যতম। তারা অপ্রতিরোধ্য, রোদ-বৃষ্টি-ঝড় কোনো কিছুই তাদের দায়িত্ব পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) অনুমোদিত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দেশব্যাপী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এবং এ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ৩.১৫ কোটি হতদরিদ্র, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে নিয়মিত ঋণ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশে এমএফআই-এর অভ্যুদয় এবং তার বিকাশের জন্য দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছিলো। এই পথ পরিক্রমায় যে প্রতিষ্ঠানটির অবদান সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, তার নাম পিকেএসএফ। এমআরএ-অনুমোদিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বড় অংশ (২৭% বা তদূর্ধ্ব) পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা। এ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এনজিও হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ও নিঃস্ব জনগণের পুনর্বাসন এবং পরবর্তীকালে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দাতা সংস্থার অনুদানে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনায় একনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। জীবন ও জীবিকা পরিচালনায় জনগণের সক্ষমতা গড়ে তুলতে এ সকল কার্যক্রম সাহায্য করে। প্রকৃত অর্থে জনগণের পারিবারিক অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য শুরু থেকেই ক্ষুদ্রঋণের সহায়তা ছিলো। তবে পিকেএসএফ-এর আবির্ভাবের পূর্বে তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৯০) থেকে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনার জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি ছোটো ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুশাসন, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতানির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে। এক পর্যায়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনায় দক্ষ হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তারা পিকেএসএফ-এর পাশাপাশি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করেছে। শুরুতে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং আগ্রহী এনজিও খুঁজে বের করে তাকে গড়ে তোলা একটি 'হারকিউলিয়ান' কাজ ছিল। পিকেএসএফ-এর সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তাগণ ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিন-রাত মেঠো পথে উপস্থিত থেকে খাল-বিল-নদী পাড়ি দিয়ে পার্টনার এনজিওদের কার্যক্রম

পকেএসএফ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনার জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুশাসন, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতানির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে এবং এক পর্যায়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনায় দক্ষ হয়ে ওঠে।

পরিদর্শন ও তাদের উন্নয়নে বুদ্ধি-পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরে অমূল্য অবদান রাখেন। এ সকল আত্মনিবেদিত, দক্ষ, প্রজ্ঞাবান কর্মকর্তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। সৌজন্য প্রকাশ, বন্ধুসুলভ আচরণ, মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা এবং সর্বোপরি সংস্থা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শদানে তারা কাউকে বিমুখ করেননি। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ও আঙ্গিকে কাজ শেখার সুযোগ তৈরি করেন বলে মাঠ পর্যায়ে তাদের উপস্থিতি সবার জন্য আনন্দ ও উদ্দীপনার উৎস।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা যে একটি জটিল এবং কষ্টসাধ্য বিষয়, তা আমাদের সকলের জানা আছে। সদিচ্ছা এবং চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো কাজে ভাটা পড়ে, লক্ষ্য অর্জনে পিছিয়ে যেতে হয়, মাঝে মধ্যে স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তাদের দ্বারা ঝুঁকি তৈরি হয়। ফলে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার সংকট তৈরি হয়। এমনটি যেকোনো প্রতিষ্ঠানে হতে পারে। তবে সঙ্গত কারণে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তা অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। কর্মীদের নিয়ে পিদিম ফাউন্ডেশনকেও একাধিকবার গভীর সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই সংকটের সময় পিকেএসএফ-এর সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ পিদিম-এর পাশে থেকে সংকট উত্তরণে অকৃপণভাবে সাহায্য করে আমাদেরকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাদের অবদানের কথা চিরদিন মনে রাখবো। সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পিকেএসএফ: উন্নয়নের সূতিকাগৃহ

এস. এম. মোস্তাফিজুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, উন্নয়ন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এক অনবদ্য বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে পিকেএসএফ একটি বাতিঘর। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশের প্রথিতযশা খ্যাতিমান যে সকল ব্যক্তিবর্গ পিকেএসএফ-এর হাল ধরেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাবেক চেয়ারম্যান এম. সাইদুজ্জামান, ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক বদিউর রহমান, মোহাম্মদ ইসমাইল হোসাইন, ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, ড. মোঃ আবদুল করিম ও মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। এ সকল আত্মনিবেদিত স্বনামধন্য গুণী ও বিজ্ঞজনের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা, ধ্যান-ধারণা ও কর্মযজ্ঞের ফলে পিকেএসএফ ক্রমান্বয়ে দেশের একটি শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। 'উন্নয়ন' মনে করে পিকেএসএফ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে রয়েছে সমতা, সততা, স্বচ্ছতা, মেধা ও কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা। পিকেএসএফ একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান, যা আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি নিবিড় মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমসহ কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সহযোগী সংস্থাকে সার্বিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করে থাকে।

'উন্নয়ন' একটি আর্থ-সামাজিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। দেশের অসহায়, সম্বলহীন, অধিকারবঞ্চিত, দুস্থ-দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিকভাবে একটি সম্মানজনক স্থানে প্রতিস্থাপন–এ স্বপ্ন ধারণ করে ১৯৮৩ সালের ১ জুলাই দৈনিক পূর্বাঞ্চল পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ও খুলনা হতে প্রকাশিত একমাত্র ইংরেজি দৈনিক ডেইলি ট্রিবিউন-এর সম্পাদক বেগম ফেরদৌসী আলীর নেতৃত্বে সমমনা কয়েকজন নারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'উন্নয়ন' ক্ষুদ্র আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ ক্রমান্বয়ে দেশের একটি শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। 'উন্নয়ন' মনে করে পিকেএসএফ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে রয়েছে সমতা, সততা, স্বচ্ছতা, মেধা ও কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংস্থাটি ধীরে ধীরে সেবা কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ঘটায় এবং আজকের এ পর্যায়ে উপনীত হয়। 'উন্নয়ন' সংস্থা ১৯৮৬ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর, ১৯৯০ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ১৯৯৩ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং ২০০৮ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে নিবন্ধন লাভ করে।

সুনিবিড় পরিবেশ, বৈষম্যহীন মানবসমাজ এবং জনগণের অংশগ্রহণে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নই 'উন্নয়ন' সংস্থার মূল দর্শন। 'উন্নয়ন' বিশ্বাস করে সহমর্মিতা একটি সামাজিক গুণ এবং বিশ্বস্ততা হলো একটি

প্রতিজ্ঞা। সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে যেকোনো কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়। নেতৃত্ব বিকাশের জন্য এ তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক।

১৯৯৩ সালের জুন মাসের ৯ তারিখে 'উন্নয়ন' পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। সে সময় থেকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নগরের দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সক্ষমতা তৈরি, মানবমর্যাদা এবং জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে 'উন্নয়ন'। পিকেএসএফ-এর সাথে আমাদের মাঠ পর্যায়ে কাজের অনেক স্মৃতি রয়েছে। এ লেখায় এমন একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়।

২০১৬ সাল। বটিয়াঘাটা উপজেলায় 'উন্নয়ন' সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সিসিসিপি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনে আসেন পিকেএসএফ-এর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। ঢাকায় যাওয়ার জন্য বিমানের ফিরতি টিকিট কাটা। স্যার একের পর এক কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন, সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছেন। বিমানের সময় স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও স্যার পরিদর্শন করেই চলেছেন। কাজ ছেড়ে মাঠ থেকে বের হতেই চাচ্ছিলেন না। এক পর্যায়ে তাড়াহুড়ো করে যশোর বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেও সেদিন স্যার ফ্লাইট ধরতে পারেননি। অতঃপর বাসে করে ঢাকায় ফেরৎ যান। এটি পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের কাজের স্পৃহা এবং একাগ্রতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত, যা আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে।

চারপাশের আলো কমে এলে অন্ধকারের সূচনা; তাতেই জড়িয়ে থাকে আগামী দিনের সূর্যালোকের ইঙ্গিত। মানুষ হয়তো এ জন্যই আশাবাদী। প্রান্তিক মানুষের এ আশাগুলো বাঁচিয়ে রাখতে পিকেএসএফ-এর কাজ চলমান থাকবে। পিকেএসএফ দিবস ২০২৪-এ এমনটাই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর সাথে দিশা

মোঃ রবিউল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক, দিশা

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ও কারিগরি সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। পিকেএসএফ তার স্বকীয়তা বজায় রেখে নতুন নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বিমোচনে নিরলস কাজ করে চলেছে। আমি ১৩ নভেম্বর পিকেএসএফ দিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।

দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা ১৯৯৮ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরুর পর থেকেই এ অঞ্চলের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং মানবিক কল্যাণের ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছে। পিকেএসএফ 'দিশা'র এ উন্নয়ন অভিযাত্রায় অভিভাবকের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে অনবদ্য অবদান রেখেছে।

> বহুমাত্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ-এর নাম হিরন্ময় দ্যুতিতে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় দিশা বর্তমানে ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পিকেএসএফ-এর নিবিড় পরিচর্যা ও অভিভাবকত্ব দিশাকে সবসময়ই প্রেরণা যোগায়।

এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় নির্মিত হয় এ অঞ্চলের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত স্থাপনা 'দিশা টাওয়ার' যেখানে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানা আচার-অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এমনকি বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালে পিকেএসএফ-এর পরামর্শে সংস্থার প্রধান কার্যালয় 'দিশা টাওয়ার' কোভিড-১৯ রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের আবাসন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পিকেএসএফ-এর পরামর্শে দেশের ক্রান্তিলগ্নে ব্যবহৃত 'দিশা টাওয়ার' এ অঞ্চলের গৌরব ও মান বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।

পিকেএসএফ-এর টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে সংস্থা 'দিশা এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করে। পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় স্থানীয় খামারিদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান, ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, পরিবেশসম্মত ও নিরাপদ উপায়ে গরু মোটাতাজাকরণ,

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের কৌলিক মান সংরক্ষণ, বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টিসহ গ্রামীণ পেশাজীবী মানুষের দারিদ্র্য নিরসন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে এ প্রতিষ্ঠান। পিকেএসএফ কর্তৃক শিক্ষাবৃত্তি প্রদান; শিক্ষা, সাস্থ্য ও পুষ্টি সহায়তায় সমৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা; প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি এবং কিশোর-কিশোরীদের মেধার বিকাশে কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ ও সংস্থাকে নিঃসন্দেহে মর্যাদাশীল করেছে। এছাড়া, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম সূতিকাগার কুষ্টিয়াতে সুস্থ ধারার লোকচর্চা তথা লালনের অমিয় বাণী সম্প্রসারণ ও শুদ্ধ লালন সঙ্গীত চর্চায় লালন সঙ্গীত বিদ্যালয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে পিকেএসএফ-এর অবদান বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি।

সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে দিশা পিকেএসএফ-এর অবিচল আস্থায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে। বহুমাত্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ-এর নাম হিরন্ময় দ্যুতিতে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। আর এ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে দিশা সত্যিকার অর্থেই গর্বিত। দিশা পরিবারের পক্ষ থেকে 'পিকেএসএফ দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপনের এই মহতী উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি। পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রম সর্বাঙ্গীণ সাফল্যমণ্ডিত হোক।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় তিন দশকের উন্নয়ন যাত্রা

মোঃ আবু জাফর
নির্বাহী পরিচালক
দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)

আজকাল 'উন্নয়ন' শব্দটি বহুল প্রচলিত এবং প্রায়শ শ্রুত শব্দগুলোর মধ্যে একটি। এটি একই সাথে যেমন বহুমাত্রিক, তেমনি একইসাথে দ্রুত পরিবর্তনশীল। এর সাথে যদি 'সামাজিক', 'অর্থনৈতিক'-এ সকল শব্দ জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে এর ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পায়। এটির সংজ্ঞা পেরো, হারলক, পিয়ারসন-এর মতো সমাজবিজ্ঞানী থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের অমর্ত্য সেনের মতো প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদগণও দিয়েছেন। কেউ প্রাধান্য দিয়েছেন পারিপার্শ্বিকতার ইতিবাচক উন্নয়নকে। কেউ প্রাধান্য দিয়েছেন আত্মিক স্বাধীনতাকে।

> অর্থনৈতিক স্বাধীনতা টেকসই করতে গেলে আরো কিছু সম্পূরক বিষয়ের প্রয়োজন। তাই, ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক বিষয়ের উন্নতি ঘটানো ছিলো সময়ের দাবি।

কালের পরিক্রমায় উন্নয়নকর্মী হিসেবে এই যাপিত জীবন আমাকে দাঁড় করিয়েছে এমন এক জায়গায় যেখানে উন্নয়নের ব্যাপকতার কাছে নিজেকে নগণ্য মনে হয়। আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে আমি যখন একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম, তখন মাঠ পর্যায়ে উন্নয়নের পরিমাপক ছিল 'ক্ষুধা'। একটা মানুষ যদি একবেলার জায়গায় দুইবেলা খেতে পারতো, তাহলে সেটাকেই সে উন্নয়ন হিসেবে বিবেচনা করতো। ১৯৯৭ সালে প্রথম যখন পিকেএসএফ-এর হাত ধরে আমি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করি, তখন ক্ষুৎপীড়িত, অসহায় মানুষগুলো অবাক হয়ে লক্ষ্য করত তাদেরকে 'খাবারের' বদলে কেউ 'অর্থ সাহায্য' দিতে এসেছে। তখন সমিতিভিত্তিক সঞ্চয় সমিতির সব থেকে দরিদ্র সদস্যকে ঋণ হিসেবে প্রদান করা হতো। ঋণ থেকে প্রাপ্য লভ্যাংশ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো। এটি ছিলো অনেক সময়সাপেক্ষ একটি প্রক্রিয়া। পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় এ তহবিল সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। তারপরও তাদেরকে বোঝাতে অনেক সময় লেগেছে যে প্রতিদিন মাছের আশায় বসে থাকার চেয়ে একটা ছিপ কিনে নেওয়া ভালো। তাই, প্রাথমিকভাবে তারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সোপানে পা রাখলেও তা ছিলো নড়বড়ে।

ক্ষুদ্রঋণের অর্থ দিয়ে শুরুতেই কেউ হয়তো ছাগল কিনেছে, কেউ চাষাবাদ করেছে। কিন্তু সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রতি উদাসীনতার কারণে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা টেকসই হয়নি। সন্তান বিপথে গিয়ে ঋণের কেনা ছাগলটা হয়তো বিক্রি করে দিয়েছে। কিংবা অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার জন্য ঋণের অর্থগুলো সঠিক পথে বিনিয়োগের বদলে চলে গিয়েছে চিকিৎসা খরচে। এদিকে সমাজের একেবারে তলানিতে পড়ে থাকা লোকটির কোনোদিন সুযোগ হয় না চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা খাওয়ার। ফলে, তার মনের ভেতরে তৈরি হয় শ্রেণিবৈষম্য-প্রসূত এক তীব্র ঘৃণা।

একটা পর্যায়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা টেকসই করতে গেলে আরো কিছু সম্পূরক বিষয়ের প্রয়োজন। তাই, ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক বিষয়ের উন্নতি ঘটানো ছিল সময়ের দাবি। পিকেএসএফ-এর হাত ধরে আমরা সেটাও করেছি শুধুমাত্র তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে। ধীরে ধীরে এমন একটা পর্যায় এসেছে যখন সেই সমাজের তলানিতে পড়ে থাকা মানুষটিও একটা কর্মক্লান্ত দিন শেষে মাথা উঁচু করে চায়ের দোকানে চা খেতে বসেছে। তার ছেলে-মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের শিক্ষাকেন্দ্রে বৈকালিক পাঠদান কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে। তার স্ত্রী বাড়িতে ছাগল কিংবা গরু পালন করে পরিবারে আর্থিক অবদান রেখে চলেছে।

এখন মাঠ পর্যায়ে গেলে সেই কর্দমাক্ত পথ পাড়ি দিতে হয় না। চোখে পড়ে না শতচ্ছিন্ন শন-পাঠকাঠির ছাপড়া ঘর। রোগশোকে এখন আর কাউকে বারবার হাসপাতালে ছুটতে হয় না। পিকেএসএফ-এর 'সমৃদ্ধি' কার্যক্রমের স্বাস্থ্য পরিদর্শকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছেন সদস্যদের দোরগোড়ায়। মানুষের হাতে সার্বক্ষণিক অর্থ আর অর্থের হাতবদলের কারণে আজ সামষ্টিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিও হয়ে গিয়েছে অপ্রতিরোধ্য। আর এসবই সম্ভব হয়েছে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আর আমাদের মত ক্ষুদ্র উন্নয়নকর্মীদের নগণ্য প্রচেষ্টার কারণে।

আজ, প্রায় তিন দশক পরে 'উন্নয়ন'- এর প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকাংশে বদলে গিয়েছে। তরুণ বয়সে যেমন মনে হতো, যেই ইতিবাচকতা দৃষ্টিগ্রাহ্য না তা উন্নয়ন হতে পারে না। কিন্তু আজ মনে হয়, উন্নয়ন ততক্ষণ পর্যন্ত সাধিত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি সামাজিক স্তরের তলানিতে থাকা একজন মানুষ হিসেবে তা ছুঁয়ে দেখার পাশাপাশি অনুভবও করতে পারছেন।

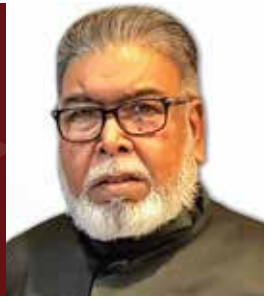

সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন

রফিক আহামদ
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, মমতা
সমাজসেবায় একুশে পদকপ্রাপ্ত (২০২৪)

একজন মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক দায়বদ্ধতারই একটি অংশ। আমার পিতা মরহুম বজল আহমদ সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার কারণে আমি ছোটোবেলা থেকেই সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা পাই। একজন মানুষ হিসেবে মানুষের জন্য কিছু করা যে মানবিক দায়বদ্ধতারই একটি অংশ, সে সম্পর্কে অবগত হই। আমার পিতা পেশায় একজন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি হওয়া সত্ত্বেও সমাজের মানুষের কথা সর্বদা চিন্তা করেছেন। তিনি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা ভেবেছেন এবং সেবা করেছেন একজন জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ এবং সমাজসেবক হিসেবে। আমি পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করি। ছাত্র অবস্থায়ই চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রায় অর্ধশতাধিক সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর শেষে আমি নিজেকে একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার ইচ্ছা পোষণ করি। একটি ব্যবসায়িক পরিবারে থেকে এ মনোবাসনা বাস্তবায়ন করা আমার পক্ষে খুব একটা সহজ ছিল না। তবুও সমাজের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা আমাকে এ পথে আসতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য না হওয়ায় অনেক প্রসূতি মাকে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে দেখেছি। প্রসব বেদনায় তাদের আর্তচিৎকারে আমার হৃদয় বেদনাক্রান্ত হয়েছে। তখনই সংকল্প করি, ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও আমি এমন কিছু করবো যাতে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মা ও শিশুরা পৃথিবীতে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে।

সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন না হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে, বিশেষত নারীদেরকে, উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি মনোনিবেশ করা হয়।

সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করার লক্ষ্যে আমার কয়েকজন বন্ধুপ্রতিম ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ ও সহযোগিতায় একটি সমাজ উন্নয়নমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করি, যার নামকরণ করি 'মমতা'। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রামে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'মমতা' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করলেও সময়ের পরিক্রমায় আমাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও আস্থা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করি, সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন না হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশেষত

নারীদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি মনোনিবেশ করা হয়। এরই লক্ষ্যে 'মমতা' সঞ্চয় ও ঋণদান (মাইক্রোফাইন্যান্স) কার্যক্রম শুরু করে।

আমাদের কার্যক্রম গতিশীল ও বেগবান করতে এগিয়ে আসে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। ১৯৮৯ সনের ১৩ নভেম্বর যখন পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন উন্নয়ন সংস্থাসহ এমএফআইসমূহের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা কাজ করে। দারিদ্র্য বিমোচনসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে নিরলস ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

'মমতা' পিকেএসএফ-এর সাথে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে ২৪ জুলাই ২০০৮ তারিখে। এটি 'মমতা'র জন্য একটি সৌভাগ্য ও মর্যাদার বলে আমি মনে করি, কারণ সমাজ উন্নয়নে পিকেএসএফ ও মমতা'র লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। পিকেএসএফ কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে 'মমতা' পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে প্রথম সারিতে স্থান করে নিতে পেরেছে। এটি অবশ্যই মমতা'র কর্মের স্বীকৃতি, একই সাথে পিকেএসএফ-এর যোগ্য নেতৃত্ব ও তাদের নিরলস কর্মগুণের মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়েছে। আমি আশা করি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে যেভাবে 'মমতা' কাজ করে চলেছে এবং পিকেএসএফ-এর অকুণ্ঠ সমর্থন পাচ্ছে, তাতে 'মমতা' ও পিকেএসএফ-এর সম্পর্ক আরও বেগবান ও সুদৃঢ় হবে।

'পিকেএসএফ দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপনের উদ্যোগ ও এ সংক্রান্ত একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশকে আমি স্বাগত জানাই। আমি বিশ্বাস করি, 'মমতা' ও পিকেএসএফ একযোগে, অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেদের অবদান ও নিরলস শ্রম অব্যাহত রাখলে তা একটি আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথপ্রদর্শক

তপন কুমার কর্মকার
নির্বাহী পরিচালক, আরডিআরএস বাংলাদেশ

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের কোচবিহারে আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশী শরণার্থীদের সাহায্যার্থে কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিস নামে কাজ শুরু করে দাতা সংস্থা লুথেরান ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন। স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হতেই ড. ওলাভ হুডনির নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরাঞ্চলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে জন্ম নেয় রংপুর-দিনাজপুর রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিস (আরডিআরএস)। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে এটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত হয়, নাম দেয়া হয় 'আরডিআরএস বাংলাদেশ'। দেশের উন্নয়নের সঙ্গী হিসেবে সেই থেকে যাত্রা শুরু।

স্বাধীনতার উষালগ্নে দেশ পুনর্গঠনে সরকারের সহযোগী হিসেবে পাশে দাঁড়ায় 'আরডিআরএস'। কোচবিহারে আশ্রয় নেয়া লাখ লাখ মানুষ যখন দেশে ফিরে আসে, তখন তাদের জন্য ত্রাণ সহায়তা, খাবার, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ছিল একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। সে সময় শরণার্থী শিবিরে ত্রাণ পৌঁছে দিয়ে, লঙ্গরখানা চালু করে এবং তাঁবু বসিয়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে 'আরডিআরএস'।

> পিকেএসএফ-এর পরামর্শ ও ঋণ সহায়তায় বর্তমানে ঋণ কার্যক্রমে প্রায় ৪ লাখ ৪৫ হাজার সদস্য আছেন, যার মধ্যে ৯২ ভাগই নারী। দেশের ২৯টি জেলায় ২৮৪টি শাখায় প্রায় ৩ হাজার কর্মীর মাধ্যমে এই কার্যক্রম চলছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অবকাঠামো গড়ার কাজেও এ সংস্থার ভূমিকা অনেক। ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত 'আরডিআরএস' মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ১৮২টি স্কুল, ২টি কলেজ এবং ৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কারে সরকারকে সহায়তা করেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেছে শিশুশিক্ষা কেন্দ্র (সিইসি)। এর মধ্যে ১৪টি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে। ১৯৯১ সালে কুড়িগ্রামে বীরপ্রতীক তারামন বিবির নামেও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কমিউনিটি মোটিভেশনাল ফাংশনাল এডুকেশন (সিএমএফই) কর্মসূচির অধীনে কুড়িগ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষিসহ আরও নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এ সংস্থা।

১৯৯১ সালে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে 'আরডিআরএস'। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর পরামর্শ ও ঋণ সহায়তায় বর্তমানে এ কার্যক্রমে প্রায় ৪ লাখ ৪৫ হাজার সদস্য আছেন, যার মধ্যে ৯২ ভাগই নারী। দেশের ২৯ জেলায় ২৮৪টি শাখায় প্রায় ৩ হাজার কর্মীর মাধ্যমে এ কার্যক্রম চলছে। এ কর্মসূচির আওতায় কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন

খাতে ঋণ দেয়া হয়। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির উদ্বৃত্ত তহবিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগকালীন ত্রাণ বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণসহ নানাবিধ সেবামূলক কাজে ব্যয় হয়।

'আরডিআরএস'-এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে দেড় হাজারের বেশি শিক্ষাকেন্দ্রে ৪৩ হাজারের অধিক শিশু শিক্ষার্থী রয়েছে। কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলের ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত ৩০০ শিশু শিক্ষার্থী এবং ইউএসএআইডির সহায়তায় ২৫০টি প্রাইভেট স্কুলে ২১,৩৪৪ শিশুর পড়াশোনা চলছে। নিজস্ব অর্থায়নে দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয় এ সংস্থা।

যুদ্ধবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে রংপুর-কুড়িগ্রাম, রংপুর-গাইবান্ধা, লালমনিরহাট-পাটগ্রাম, কুড়িগ্রাম-চিলমারী সড়ক ও কুড়িগ্রাম শহর রক্ষা বাধসহ ৭০১ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করেছে 'আরডিআরএস'। এছাড়া, স্থানীয় সরকারের সাথে অংশীদারত্বে ৭,১৫০ কিলোমিটার রাস্তার ধারে, পতিত জমি, স্কুল মাঠ এবং বসতভিটায় প্রায় ৮০ লাখ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের কৃষি উৎপাদন বাড়াতে বিনামূল্যে ট্রাক্টর ও পাম্পের সাহায্যে সেচ সুবিধা, বিনামূল্যে বীজ বিতরণ, এমনকি হাল চাষের জন্য কৃষকদের গরু দেয়া হয়। প্রান্তিক কৃষকদের জন্য স্বল্পমূল্যের সেচযন্ত্র 'ট্রেডল পাম্প' ছিল 'আরডিআরএস'-এর অভিনব আবিষ্কার। সমন্বিত চাষ পদ্ধতি, দ্রুত ফলনশীল ও বন্যা সহনশীল ধান উদ্ভাবনের মাধ্যমে মঙ্গার স্থিতিকাল কমিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলছে এ সংস্থা।

দীর্ঘ ৫২ বছরে 'আরডিআরএস' বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে অনেক সুনাম কুঁড়িয়েছে। সততা, স্বচ্ছতা, দায়িত্ববোধ ও সুশাসন 'আরডিআরএস'কে করেছে অনন্য। সংস্থার পরিচালনা পর্ষদে থাকা বিশিষ্ট ও বহুমুখী যোগ্যতাসম্পন্ন গুণীজনদের পরামর্শে এবং পিকেএসএফ-এর সহায়তায় 'আরডিআরএস' এগিয়ে যাচ্ছে, আগামীতেও এগিয়ে যাবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা অনন্য

এম.এ. রশিদ
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার কর্তৃক গঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অন্যতম সহযোগী সংস্থা আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ে তহবিল সরবরাহে সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। পাশাপাশি, সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অনন্য অবদান রেখে চলেছে।

আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ১৯৯৭ সালের জুন মাসে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ২০০১ সালে অতিদরিদ্রদের নিয়ে কাজ করার সুযোগ পায়। এ সময় একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থাটি ৫,০০০ অতিদরিদ্র পরিবারের উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ পায়।

> কাউকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করলে এবং তিনি সঠিকভাবে কাজ করলে অবস্থার উন্নতি হবেই।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের আন্তরিক তত্ত্বাবধান ও পরিকল্পনায় প্রকল্পটির মাধ্যমে অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। প্রথমে পরিকল্পনা করা হয় কোনো পরিবারকে কী ধরনের সুযোগ সুবিধা দিলে তারা ভালো করবে। এক্ষেত্রে, পরিবারের কর্তাকে আলাদা করা হয়। কারণ পরিবারের কর্তা অন্যত্র কাজ না করলে পরিবারের জীবিকায়ন স্থবির হয়ে পড়বে। তাই পরিবারের কর্তাকে বাদ দিয়ে অন্যান্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। নারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কলা চাষ, পেঁপে চাষ, সবজি চাষ, আখ চাষ, মুরগি পালন, গাভী পালন ও সেলাই কাজে।

যারা কৃষিকাজ করতে পারবে তাদেরকে অন্যের জমি লিজ নিয়ে দেওয়া হয় দুই বছরের জন্য। প্রশিক্ষিত নারীরা কলা বাগান, পেঁপে বাগান, সবজি ক্ষেত, আখ ক্ষেতে কাজ করে একেকজন দুই বছরে আয় করে ৩০-৫০ হাজার টাকা। এটি ২০০১ সালের কথা। তখনকার সময় মেয়েরা অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতো। মেয়েরা বাইরে বেরিয়ে কাজ করলে সমাজ তাদের অন্যভাবে দেখতো। নিজেদের কৃষি ক্ষেতে নারীরা কাজ করতো আর স্বামীরা রাতে ফিরে তাদের কাজে সাহায্য করতো। যারা কলা, পেঁপে, সবজি ও আখ চাষ করেছে, দুই বছর পর তাদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। অন্যদিকে, ৪৫০ জন মেয়েকে একমাস প্রশিক্ষণ দিয়ে গার্মেন্টসে কাজ করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এছাড়া, ৯৫০ জন নারীকে এক মাস সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি করে সেলাই মেশিন কিনে দেওয়া হয়। ফুলবাড়িয়া ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলার গ্রামসমূহে একমাস প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিটি গ্রামে একজন করে রাজমিস্ত্রি তৈরি করা হয়। এ রাজমিস্ত্রিরা স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও পিলার বানানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গ্রামে গ্রামে

স্যানিটারির কারখানা দেয়। তারপর এলাকাবাসীকে বলা হয় বাড়িতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করলে ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে। এ সংবাদ শুনে সবাই বাড়িতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করে। এক পর্যায়ে গ্রামের সকল বাড়িতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপিত হয় এবং রাজমিস্ত্রিরাও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন মনে করে, কাউকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করলে এবং তিনি সঠিকভাবে কাজ করলে অবস্থার উন্নতি হবেই।

পিকেএফএফ-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি সমন্বিত পরিবার উন্নয়নের একটি যুগান্তকারী মডেল যা, আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন 'ডোর টু ডোর এ্যাপ্রোচ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ এই এ্যাপ্রোচটিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য একটি কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৫ সাল হতে নরওয়ে সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দাতা সংস্থা নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর একচেঞ্জ কো-অপারেশন (NOREC)-এর অর্থায়নে আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন একটি এক্সচেঞ্জ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির আওতায় আসপাডা সমৃদ্ধি মডেলটি নেপালের চিতওয়ানে অবস্থিত 'সহমতি' এনজিও-এর সাথে বিনিময় করে। সমৃদ্ধি মডেলটি NOREC ও সহমতি নেপালের প্রেক্ষাপটে কার্যকরি এ্যাপ্রোচ হিসেবে পছন্দ করায় আসপাডা সংস্থার দুইজন কর্মকর্তা নেপালে অবস্থান করে এ মডেলটি সফলভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০২১ সাল হতে এ মডেল ভারতের ইন্দোরে অবস্থিত 'পাহাল জনসহায়ক বিকাশ সংস্থা' ও কম্বোডিয়ার নমপেনে অবস্থিত 'ক্রোসার ইয়ং এসোসিয়েশন' আসপাডা'র কর্মকর্তাগণের সরাসরি সহায়তায় তাদের দেশে বাস্তবায়ন করছে। বাস্তবায়ন শেষে মডেলটি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে যুক্ত করায় সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পিকেএসএফ: সংগ্রাম-এর আলোকবর্তিকা

চৌধুরী মুনীর হোসেন
নির্বাহী পরিচালক, সংগ্রাম, বরগুনা

'সংগ্রাম' উপকূলীয় অঞ্চলে কর্মরত একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে পাথরঘাটায় 'সংগ্রাম' প্রতিষ্ঠিত হয়। বরগুনা জেলার দক্ষিণে সাগর, পশ্চিমে সুন্দরবন। সারা ভূখণ্ড জুড়ে রয়েছে ছোটো বড় অসংখ্য নদী ও খাল। প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বরগুনা জেলার মানুষের জীবন ব্যবস্থা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কিছুটা অস্থিতিশীল ও গতানুগতিক ধারা থেকে ভিন্নতর। বর্তমানে সংগ্রাম-এর কর্মসূচি, লোকবল ও কর্মএলাকা বরিশাল বিভাগের সর্বত্র বিরাজমান।

> আর্থসামাজিক উন্নয়নে 'সংগ্রাম' আজ অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। 'সংগ্রাম'-এর এ বিকাশের পেছনে পিকেএসএফ-এর অবদান অনস্বীকার্য।

'সংগ্রাম' প্রতিষ্ঠার পর সর্বপ্রথম যে প্রতিষ্ঠানের সহায়তা পেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে তার নাম পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। ১৯৮৫ সালে যাত্রা শুরু করলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংস্থার ভৌগোলিক অবস্থান, অসম যোগাযোগ ব্যবস্থা, অনুদান প্রাপ্তির কৌশল সম্পর্কে স্বল্প ধারণার কারণে অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল সংগ্রাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সংস্থাটির তখনকার নির্বাহী পরিচালক সংস্থার কলেবর বৃদ্ধি ও অনুদান পাওয়ার আশা যখন ছেড়ে দিয়েছেন তখন ২৯০ নটিক্যাল মাইল লঞ্চপথ পাড়ি দিয়ে সুদূর সাগর কন্যা পাথরঘাটায় পিকেএসএফ-এর একজন কর্মকর্তা 'সংগ্রাম'-এর আশীর্বাদ হয়ে এলেন পিকেএসএফ-এর বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি রাস্তাহীন, পরিবহণহীন 'সংগ্রাম'-এর কর্মএলাকা ঘুরে দেখে অনেক সম্ভাবনার কথা শোনালেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নির্দেশনায় 'সংগ্রাম' ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে পিকেএসএফ-এর ৩২তম সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

এনজিওদের স্থিতিশীল করার প্রশ্নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'সংগ্রাম' পিকেএসএফ-এর তালিকাভুক্ত হওয়ার পর ঋণ কর্মসূচি শুরু করে। পিকেএসএফ থেকে ঋণ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, ফরম্যাট, নীতিমালা ও ঋণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার কৌশল বিষয়ে সংস্থা প্রশিক্ষণ পেয়েছে। নির্দিষ্ট সময় পরপর পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ পরিদর্শনে এসে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। ফলে সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে ও অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। 'সংগ্রাম' যখনই কোনো সমস্যায় পড়েছে বা সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তখনই 'সংগ্রাম'-এর পাশে দাঁড়িয়েছে পিকেএসএফ। পরামর্শ, দিকনির্দেশনা, সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে বিপদ কাটিয়ে ওঠার জন্য মাথার ওপর ছাতার মতো থেকে সার্বক্ষণিক নজর রেখেছে। তাই 'সংগ্রাম'-এর বেড়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার পিকেএসএফ।

'সংগ্রাম' পরিবার পিকেএসএফ-এর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষ করে সিডর-পরবর্তী সময় সরকারি সিদ্ধান্তে ১ বছর ৮ মাস মাঠ পর্যায়ে ঋণ উত্তোলন বন্ধ থাকে। অন্যদিকে সংস্থার লভ্যাংশ থেকে দীর্ঘ সময় ধরে স্টাফদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করায় সংস্থার সারপ্লাস নিম্নমুখী হয়ে যায়। উপরন্তু, আকাশচুম্বী বকেয়ার পাহাড় তৈরি হয়ে সংস্থা ডুবুডুবু অবস্থায় চলে যায়। সেই ক্ষণে শক্ত হাতে 'সংগ্রাম'-এর পাশে দাঁড়ায় পিকেএসএফ। পরিস্থিতি বিবেচনা করে অভুক্ত সদস্যদের জন্য প্রাইম-টু কার্যক্রম চালু করে। এ কাজে 'সংগ্রাম' স্টাফদের সম্পৃক্ত করে বেতন প্রদানের দায়িত্ব পিকেএসএফ নিজ হাতে তুলে নেয়। ভুক্তভোগী সদস্যদের বিনা সার্ভিস চার্জে সাহস ঋণ, নমনীয়-সহনীয় সার্ভিস চার্জে রেসকিউ ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমে গতি ফিরিয়ে আনে। এভাবে 'সংগ্রাম' আবার ঘুরে দাঁড়ায়।

'ক্রেডিট প্লাস' কার্যক্রম পিকেএসএফ-এর একটি বিশেষ উদ্যোগ। পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল ও 'সংগ্রাম'-এর কস্ট শেয়ারিং-এর ফলে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে লক্ষ্যভুক্ত অংশীজনদের জীবনমানের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। 'সংগ্রাম' পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিউনিটিতে সংস্থার অবস্থান দৃঢ় হয় এবং মানবিক উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে একজন অসহায় প্রবীণ প্রতি মাসে পরিপোষক ভাতা পেয়েছেন, লাঠি, কম্বল, কমোড ল্যাট্রিন, এমনকি মৃত্যুর পর তার পরিবার সৎকারের জন্য অনুদান পেয়েছে। এটা সামাজিক চেতনাকে নতুনভাবে জাগ্রত করেছে, দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ও সংস্থামুখী জনমত গড়ে উঠেছে।

পিকেএসএফ সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা সহযোগী সংস্থাগুলোর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করছে। 'সংগ্রাম' পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাইম-টু, সংযোগ, সিসিসিপি, কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প, আধুনিক পদ্ধতিতে মুগডাল ও বসতবাড়িতে সবজি চাষ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তার আয়বৃদ্ধিকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নে ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্সভিত্তিক বিপণন উপ-প্রকল্প। এছাড়া, বাংলাদেশের দক্ষিণে উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে পরিবেশবান্ধব বিষমুক্ত ও নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প, ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প ইত্যাদি। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মএলাকার অংশীজনদের জীবন ও জীবিকা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কারিগরি সহায়তা, মানবিক উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ ও জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে 'সংগ্রাম'।

সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা প্রদান ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ঋণ কর্মসূচিতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন করে 'সংগ্রাম'কে উপকূলীয় অঞ্চলে সফল ও কার্যকরি সহায়তা করছে পিকেএসএফ। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'সংগ্রাম'-এর লাউপাড়া শাখার সদস্য আবদুস ছোমেদ ফকির, যিনি ২০১৪ সালে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কৃষি উদ্যোক্তার পুরস্কার লাভ করেছেন। একই খাতে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে সেকেন্ড রানার্সআপ হয়েছেন কড়ইবাড়িয়া শাখার সদস্য আজিজুল হক সিকদার। 'সংগ্রাম'-এর মাধ্যমে বর্তমানে অনেকগুলো পরিবার আর্থিক সচ্ছলতার পাশাপাশি সম্মানের সাথে জীবনযাপন করছে। স্থানীয় সম্পদ সমাবেশীকরণের মাধ্যমে এলাকায় বহু ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে উঠেছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নে 'সংগ্রাম' আজ অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। 'সংগ্রাম'-এর এ বিকাশের পেছনে পিকেএসএফ-এর অবদান অনস্বীকার্য। পিকেএসএফ দিবস ২০২৪-এ 'সংগ্রাম'-এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় নাটোরে ভেষজ পণ্য উৎপাদনে সাফল্যের গল্প

এএফএম আখতার উদ্দিন
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, ইউডিপিএস

উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি ১৯৮৬ সালে ঠাকুরগাঁও জেলার সালন্দর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ছাড়াও বহুবিধ সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সংস্থার অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে নাটোর সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর খোলাবাড়িয়া, বড়হরিশপুর গ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষভাবে পরিচিতি দিয়েছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর প্রায় ৭০ ভাগ মানুষের রোগ নিরাময়ে ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহৃত হচ্ছে। ইউনানি, আয়ুর্বেদিক, অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজিসহ বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ওষুধ তৈরিতে ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহার করে থাকে। পরিসংখ্যান মতে, ২০৫০ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে ভেষজের বাণিজ্য হবে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে ভেষজ ওষুধ বিক্রির পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা, যা ২০১০ সালে বেড়ে এক হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ২১০টি আয়ুর্বেদিক ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ২৭২ প্রকারের ওষুধ তৈরি করছে। দেশে প্রায় এক হাজার প্রজাতির ওষধি উদ্ভিদ থাকলেও এ পর্যন্ত মাত্র ৪৫০ ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ভেষজ সামগ্রী আমদানি করে থাকে। অথচ দেশের ওষুধ শিল্পে যে পরিমাণ ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয় তার ৭০ ভাগই স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা সম্ভব।

নাটোর জেলার সদর উপজেলার খোলাবাড়ীয়া, লক্ষ্মীপুর, বড়হরিশপুর এলাকায় কবিরাজ আফাজ উদ্দিনের প্রচেষ্টায় হাতে গোনা কয়েকটি ওষধি প্রজাতি যেমন-অ্যালোভেরা, অশ্বগন্ধা, শতমূল, তালমূল, বীর্যমনি, শিমূল মূল, বাসক, তুলসি, কালোমেঘ প্রভৃতি চাষাবাদ শুরু হয়। পরবর্তীকালে ২০০৪ সাল থেকে ঔষধি প্রজাতির সংখ্যা ও চাষের পরিসর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২০১৭ সালে এই সাব-সেক্টরটির প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ও ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতিতে এর অসামান্য অবদানের বিষয়টি গুরুত্বারোপ করে এগিয়ে আসে দেশের জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন সংস্থা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও এর সহযোগী সংস্থা উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (ইউডিপিএস)। প্রথম পর্যায়ে সাব-সেক্টরটির ভ্যালু চেইন প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা হয় এবং এর আলোকে ২০১৭ সালে পিকেএসএফ-এর Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় 'মানসম্পন্ন ভেষজ পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন' নামক একটি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অর্থায়ন করে পিকেএসএফ ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এবং পিকেএসএফ-এর কারিগরি সহযোগিতায় উপ-প্রকল্পের সকল কার্যক্রম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন

করে ইউডিপিএস। এই উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে এক লক্ষের অধিক কৃষক ও উদ্যোক্তাকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

এই উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ইউডিপিএস 'ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদন' ভ্যালু চেইনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ, যেমন স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্পন্ন ও নিরাপদ কৃষি উপকরণের (উন্নত বীজ, চারা/কাটিং, জৈব সার ও বালাইনাশক প্রভৃতি) অভাব, প্রক্রিয়াজাতকরণে সেকেলে প্রযুক্তির ব্যবহার, বাজারজাতকরণে দক্ষতার অভাব ইত্যাদি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পিকেএসএফ ও ইউডিপিএস-এর সার্বিক সহায়তায় কৃষকদেরকে ভেষজ চাষে নিরাপদ কৃষি উপকরণ ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা হয়, যাতে করে সতেজ ও নিরাপদ ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদন নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি, প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা হয়। শতভাগ নিরাপদ ও মানসম্পন্ন ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদন নিশ্চিত হলে পরবর্তীকালে দেশের শীর্ষ স্থানীয় ১২টি ইউনানি আয়ুর্বেদিক কোম্পানির সাথে উদ্যোক্তাদের চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ভেষজ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কালেকশন পয়েন্ট বা ওপেন মার্কেট তৈরি করা হয়।

উপ-প্রকল্পটির মাধ্যমে কৃষক/উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মএলাকায় কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে এবং মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। চাষাবাদে উত্তম কৃষি চর্চার প্রচলন ও আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে রোগ, পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব কমেছে, যার ফলে উৎপাদন ব্যয় কমেছে এবং পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউডিপিএস প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় উদ্যোক্তাদের উৎপাদন খরচ হ্রাস, স্বল্প ব্যয়ে অধিক আয় ও বাজার সম্প্রসারণে মাঠ পর্যায়ে কিছু উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড চর্চা করছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড শতভাগ সফল হয়েছে এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ে এর ব্যাপক সাড়া পড়েছে ও স্থিতিশীলতা পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী চর্চা হচ্ছে লাভজনক ফসল হিসেবে বিটরুট, চিয়াবীজ, কিনোয়ার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, বিনা চাষে রসুন ও অশ্বগন্ধার মিক্সড ক্রপিং, আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈলবীজ/মৌ-ফসল চাষের সম্প্রসারণ, মৌ চাষী উন্নয়ন, মেডিসিন্যাল মধু উৎপাদন, ব্র্যান্ডিং, সনদায়ন ও বাজারজাতকরণ, ঔষধি ও ভোজ্য তেল তৈরির কারখানা উন্নয়ন, সোলার টানেল ড্রায়ার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, এফ-কমার্স/ই-কমার্স শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি।

নাটোর সদর উপজেলার আওতাধীন ভেষজ ব্যবসাগুচ্ছের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণে পিকেএসএফ ও ইউডিপিএস-এর গ্রহণকৃত ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পটি ছিল সত্যিই একটি সময়োপযোগী আদর্শমান প্রকল্প। প্রকল্পটির কার্যক্রম শেষ হয়েছে কিন্তু প্রকল্পের উদ্যোক্তা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে ইউডিপিএস থেমে নেই। ইউডিপিএস থেকে ভেষজ উদ্যোক্তাগণ যেসব কারিগরি ও আর্থিক পরিষেবা পেয়েছেন তা উত্তরোত্তর এর পরিধি বৃদ্ধি করেছে। উদ্যোক্তাদের এই সফলতার পথে ইউডিপিএস সবসময় পাশে থেকেছে। সংস্থার কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল ও পিকেএসএফ-এর অগ্রসর ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের মাঝে কারিগরি ও আর্থিক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে ইউডিপিএস। উদ্যোক্তাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণে ইউডিপিএস বদ্ধপরিকর।

পিকেএসএফ: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দিন বদলের সহযাত্রী

অসীম কুমার দত্ত
নির্বাহী পরিচালক, এফডিএসআর

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার ৭টি ইউনিয়নে অসহায় এবং দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস এ্যান্ড রিসার্চ (এফডিএসআর) সংস্থাটি পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বাস্থ্যশিক্ষা ও অসহায় সেবাসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

এফডিএসআর জাতীয় পর্যায়ের অরাজনৈতিক, অলাভজনক একটি বেসরকারি সমাজসেবামূলক সংস্থা। একদল সমাজসেবী, পেশাজীবী ও চিকিৎসকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সংস্থাটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি উন্নয়ন, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় সেবামূলক এবং ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০০২ সালে এফডিএসআর পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় অনেক সদস্যের সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেরা আত্মনির্ভরশীল হয়েছে। অনেক সদস্যের বাড়িতে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি এবং অন্যান্য গবাদি পশুসহ নানান স্থাবর সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, অনেকের স্বামী বা ছেলে অটোরিকশা বা ভ্যান গাড়ি ক্রয় করে সংসারে সচ্ছলতা আনতে সক্ষম হয়েছেন।

পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় সংস্থায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, সংস্থার কর্মী এবং তাদের পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। পিকেএসএফ-এর নানামুখী কর্মসূচির কারণে সংস্থা আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের কর্মএলাকার মানুষ নিজেরাই নিজেদের জীবনমান উন্নয়নে এগিয়ে এসেছে। তাদের অগ্রযাত্রায় আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি – এটাই আমাদের সংস্থার সর্বোত্তম সফলতা।

উন্নয়ন ভাবনা: পিকেএসএফ ও এমএসএস

মোঃ আখতারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, মানবিক সাহায্য সংস্থা

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দরিদ্রতাকে পুঁজি করে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রমের বিকাশ ঘটে। সরকারি সংস্থাসমূহ যখন দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছিল, তখনই দাতা দেশগুলোর সহায়তায় এবং কিছু দেশীয় ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) এমনই একটি বেসরকারি সংস্থা, যা বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ১৯৭৪ সালে সংস্থাটির যাত্রা শুরু। দেশে দুর্ভিক্ষের সময় প্রচণ্ড শীতে স্বল্প আয়ের মানুষ খাবারের পাশাপাশি শীতবস্ত্রের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কয়েকজন তরুণ বন্ধু মিলে নিজেদের বাড়ি থেকে ব্যবহৃত পুরোনো কাপড়ের পাশাপাশি নতুন কাপড় কিনে এসব অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ শুরু করে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। এ পরিস্থিতিতে দেশের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লাকে দিয়ে 'চ্যারিটি শো'র মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে তারা সহায়তা করেন।

এমন বাস্তবতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে বন্ধুদের জমানো টাকা থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবার পাশাপাশি স্বল্পলাভে বিনিয়োগ শুরু করেন। প্রতিষ্ঠাতাগণ অর্জিত টাকায় পর্যায়ক্রমে সেবাবঞ্চিত মানুষের ব্যবসা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি কীভাবে তারা লাভবান হতে পারেন সে সম্পর্কেও ধারণা ও সহযোগিতা করতে থাকেন। ধীরে ধীরে সংস্থাটির ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীকালে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়।

> ক্ষুদ্রঋণ খাতের টেকসই সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখে তাদের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মজুরিভিত্তিক এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মযজ্ঞ চলমান।

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) ২০০৭ সাল থেকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে পিকেএসএফ-এ তালিকাভুক্ত রয়েছে। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এমএসএস। এছাড়া, সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নেও পিকেএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বর্তমানে সংস্থাটি ১৭ জেলায় ১৬২টি শাখার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের জনগণকে জামানতবিহীন প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করছে। ক্ষুদ্রঋণ খাতের টেকসই সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখে তাদের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মজুরিভিত্তিক এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মযজ্ঞ চলমান। পাশাপাশি উদ্যোক্তা তৈরিতে, বিশেষ করে নারীদের সহযোগিতার মাধ্যমে

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষা এবং দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এমএসএস ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে Eye-Care Program, Non-Formal Primary Education, Pre-Primary Schools, MSS-Technical Institute, ENRICH, Disaster Relief, Scholarships (Medha Bikash, PKSF, Suchala) কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ৯ম সিটি ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার হিসেবে 'বছরের শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা' হিসেবে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) স্বীকৃতি লাভ করে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে পিকেএসএফ ও ইপসা'র অনন্য অর্জন

মোঃ আরিফুর রহমান
প্রধান নির্বাহী, ইপসা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ৩৪ বছরের সফল পদচারণায় পিকেএসএফ পরিবারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পিকেএসএফ-এর নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তা ও শুভানুধ্যায়ীদের অবিরল স্নেহ, সম্মান, আন্তরিকতা, সুদূরপ্রসারী নির্দেশনা, মোটিভেশন, অগ্রগামী চিন্তা-চেতনা আমার সাংগঠনিক ও পেশাজীবনে একই সূত্রে গাঁথা।

২০০৬ সালে 'ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)' পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয় এবং পিকেএসএফ-এর সাথে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সূচনা করে। পর্যায়ক্রমে সমৃদ্ধি কর্মসূচি, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, কৈশোর কর্মসূচি, ইকো-ট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়ন, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ ও বিকল্প ফসল উৎপাদন, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, প্রক্রিয়াজাত ভোগ্যপণ্য, নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন, উচ্চমূল্যের ফল-ফসলের জাত সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানান উদ্যোগ গ্রহণে এবং কারিগরি ও আর্থিকভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণে পিকেএসএফ হতে ইপসা অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে আসছে। দীর্ঘসময় ধরে পিকেএসএফ-এর সাথে সার্বক্ষণিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনে বিশেষ করে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর মূলমন্ত্র 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' বাস্তবায়নে আগ্রহী হয় ইপসা। পিকেএসএফ-কে আমার স্বপ্ন, কর্মকৌশল ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করি। পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ কার্যকর, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে আমার প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করেন।

দীর্ঘসময় ধরে পিকেএসএফ-এর সাথে সার্বক্ষণিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনে বিশেষ করে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর মূলমন্ত্র 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' বাস্তবায়নে আগ্রহী হয় ইপসা।

২০১৫ সালে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় আমি ইপসা'য় 'প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন' শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণে উদ্দীপ্ত হই। এ প্রকল্প গ্রহণ করতে গিয়ে আমি চিন্তা করলাম, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য এটি একটি মডেল কৌশলও হতে পারে। যে কৌশলটি পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। ফলাফলস্বরূপ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ধারাবাহিক উন্নয়ন হবে ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে, স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হবে এবং সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন স্থায়িত্বশীল করতে সহায়ক হবে।

এ প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন কর্মএলাকায় প্রাথমিকভাবে ২৫০ জন ও পরবর্তীকালে ২,৫০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করে সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টিসহ স্বল্প সার্ভিস চার্জে ঋণ প্রদান করে। পাশাপাশি, তাদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে ও সামাজিক নেতৃত্ব বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে চাহিদাভিত্তিক স্বল্প সার্ভিস চার্জে ঋণের টাকা প্রদান করা হয়। এ অর্থ ব্যবহার করে তারা স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম যেমন: ক্ষুদ্র ব্যবসা, গরু-ছাগলের খামার, হাঁস-মুরগির খামার, হস্তশিল্প, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও কৃষিভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণসহ বিভিন্ন আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ ও প্রবেশগম্যতা শতভাগ নিশ্চিত করা হয়। পরীক্ষামূলক এ প্রকল্পটি পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসিত হয়।

পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে আমি নিজের মাঠ পর্যায়ের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিভিন্ন ধারণাপত্র ও লেখালেখি শুরু করি। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে দায়িত্ব পালন ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রেরণা পাই। পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের অনুপ্রেরণায় আমি ভারতের টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি (টিআইইউ) ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-এ 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন'-এর ওপর পিএইচডি কোর্সে অংশগ্রহণ করি। এ বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার জন্য প্রযোজ্য কোর্স ওয়ার্ক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন একাডেমিক সেমিনারে অংশগ্রহণ ও উপস্থাপন, বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার সাথে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের পত্রিকা ও জার্নালে লেখা প্রকাশ, কেইস স্টাডিভিত্তিক প্রকাশনা করি। আমার পিএইচডি কোর্স শেষ পর্যায়ে। এ কোর্স আমার শেখার ও বিশ্লেষণের দক্ষতাকে বাস্তবতার নিরিখে আরো বিকশিত করছে। পিকেএসএফ-এর সুহৃদ, শুভার্থী কর্মকর্তাবৃন্দ বরাবরই সৃজনশীল, সংস্কৃতিমনা, প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব ও সমমনা পর্যায়ের হওয়াতে এ অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ-ও আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। যাদের গভীর ভালোবাসা ও চমৎকার উপদেশনা আমার সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সবসময়ই অভূতপূর্ব অনুভূতির মতো জড়িয়ে থাকবে।

আগামী দিনেও প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের প্রতিটি কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ইপসা ও পিকেএসএফ একে অন্যের কার্যক্রমের পরিপূরক সহযাত্রী হয়ে থাকবে এ প্রত্যাশা করি।

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আম্বালা ফাউন্ডেশন

আরিফ সিকদার
নির্বাহী পরিচালক, আম্বালা ফাউন্ডেশন

আম্বালা ফাউন্ডেশন একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, বেসরকারি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৯৪ সাল থেকে সুনামের সাথে কাজ করছে সংস্থাটি। বর্তমানে বাংলাদেশের ২১ জেলায় ২৪১টি শাখার মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে আম্বালা ফাউন্ডেশন। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সংস্থাটির মূল কার্যক্রম হলেও এর যাত্রা শুরু হয়েছিল দাতা সংস্থার অর্থায়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, সেভ দ্যা চিলড্রেন, রুম টু রিড, অক্সফাম, জাপান অ্যাম্বেসিসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন, বিকল্প কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে আম্বালা ফাউন্ডেশন।

২০০২ সাল থেকে মূলত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে সংস্থাটি এবং ২০০৪ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। ২১ এপ্রিল ২০০৪ সালে আমরা পিকেএসএফ থেকে প্রথম ১ লক্ষ টাকা ঋণ পাই। দিনটি এখনো আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। বর্তমানে আম্বালা ফাউন্ডেশন-এ পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতির পরিমাণ ৫৭ কোটি টাকার ওপর এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সদস্য সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৭৫ হাজারের অধিক।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় আম্বালা ফাউন্ডেশন ১০ জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত ও হুমকির মুখে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিতে কাজ করছে।

ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি আম্বালা ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। সংস্থার কর্ম এলাকার ৭ জেলার ৫০টি শাখায় 'বিডি রুরাল ওয়াশ ফর হিউম্যান ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের উন্নত ও নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর 'মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট (এমএফসিই)' প্রকল্পের আওতায় আম্বালা ফাউন্ডেশন ১০ জেলার ৮০টি শাখার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত ও হুমকির মুখে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিতে কাজ করছে।

আম্বালা ফাউন্ডেশন নিজস্ব অর্থায়নে 'স্বপ্নযাত্রা' শীর্ষক দরিদ্র মেধাবী শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ১৬২ জন (১১০ ছেলে ও ৫২ মেয়ে) দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এছাড়া, নিজস্ব অর্থায়নে রেডিও বিক্রমপুর ৯৯.২ এফএম নামে একটি কমিউনিটি

রেডিও পরিচালনা করা হচ্ছে। এটি ঢাকা জেলার একমাত্র কমিউনিটি রেডিও এবং এর মাধ্যমে প্রতিদিন ন্যূনতম ৯ লক্ষ শ্রোতা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও সাম্প্রতিক বিশ্ব সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারছে।

সংস্থার সকল কার্যক্রম সফটওয়্যারভিত্তিক এবং প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকির জন্য ERP সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ, কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় আজ আম্বালা ফাউন্ডেশন এ অবস্থানে আসতে পেরেছে। এজন্য আমি সকল কর্মীদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

উপকূলের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ-এর দৃপ্ত পদচারণা

জাকির হোসেন মুহিন
নির্বাহী পরিচালক
গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)

নদীভাঙ্গন বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাসমূহের নিত্যসঙ্গী। এ এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) দ্বীপ জেলা ভোলায় আত্মপ্রকাশ করে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উন্নয়ন সংস্থাটি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করে। সংস্থাটি এ কার্যক্রমকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে তৃণমূলের মানুষকে আর্থিক অর্ন্তভুক্তিমূলক কার্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত করে। পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির দ্বার উন্মোচনের লক্ষ্যে সংস্থাটি ২০০১ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে যুক্ত হয়ে সরকারের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় সংস্থাটি ৩৪টি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় দরিদ্র মানুষের দৈনন্দিন আয় বৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, ভিন্ন আয়ের উৎস সৃষ্টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষার মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবা, মাদক নিরাময় ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছে।

বর্তমানে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় জিজেইউএস ৭৪টি শাখার মাধ্যমে ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি ও লক্ষিপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার ১,০৭,৩৫২ জন সদস্যের জীবিকার মান ও গৃহায়ন উন্নয়নে কাজ করছে। উন্নয়নে এই অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ-কে সবসময় পাশে পেয়ে সংস্থাটি আজ ধন্য। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) জলবায়ু অভিযোজন, নারীর ক্ষমতায়ন ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে তার সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সগর্বে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উন্নয়নধারা অব্যাহত রেখেছে।

জলবায়ু অভিযোজন, নারীর ক্ষমতায়ন ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সগর্বে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উন্নয়নধারা অব্যাহত রেখেছে।

পিকেএসএফ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ দিবসটি আমাদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ এটি আমাদের দীর্ঘদিনের উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং অর্জনগুলির এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন

ও তাদের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকাকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমরা পিকেএসএফ-কে আন্তরিক অভিবাদন জানাই। আমাদের এই দীর্ঘ উন্নয়ন যাত্রায় আমরা সবসময় পিকেএসএফ-কে আমাদের পাশে পেয়েছি স্নেহমাখা অভিভাবক হিসেবে। পিকেএসএফ আমাদের প্রতিনিয়ত অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহায়তার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে অবিরত।

পিকেএসএফ দিবসে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্যময় ধারণা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারি। উন্নয়নের এ নতুন ধারণা ও সাফল্যগুলোর অভিষ্ট জ্ঞান পরবর্তীতে আমরা তৃণমূল জনগণের দোরগোড়ায় প্রচারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা রাখবো।

পিকেএসএফ-এর এ আয়োজনের মাধ্যমে আমরা বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেয়ার প্রত্যাশা করি। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পিকেএসএফ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন সফল হবে বলে আমরা আশাবাদী।

অর্থনৈতিক মুক্তি ও মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে চাই সমন্বিত উন্নয়ন

মোঃ মাহবুব-উল আলম
প্রধান নির্বাহী, শার্প

দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসসহ সামাজিক উন্নয়নের সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সেই সাথে টেকসই উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, মানবসম্পদ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নেও এসেছে অভূতপূর্ব সাফল্য।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সেই 'বাস্কেট কেস অব বাংলাদেশ' (তলাবিহীন ঝুড়ি) এখন উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের এই ম্যাজিক্যাল উন্নয়ন ও অগ্রগতি অনেক দেশের কাছে এখন রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্বের ভূ-রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বাংলাদেশের এই মহাকাব্যিক আবির্ভাবের পিছনে সহযোগী ও স্বপসারথি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

সেলফ হেল্‌প এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম-শার্প পিকেএসএফ-এর অন্যতম একটি সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। শার্প ১৯৯৪ সাল থেকে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কাজ শুরু করলেও ১৯৯৯ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র ঋণ কার্যক্রম দিয়ে শুরু করলেও পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে শার্প।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শামিল করতে গত দুই দশক ধরে সফলভাবে বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন, আর্থিক অর্ন্তভুক্তি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় শার্প অনন্য নজির স্থাপন করছে।

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ যেন মানবিক মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারেন সেটিই আমাদের মূল লক্ষ্য। সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা যাচাই করে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মসংস্থানে সহায়তা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা, জলবায়ু ও অভিঘাত মোকাবিলায় কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি, সরকারি বিভিন্ন সেবা ও সুযোগে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ নানামুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এছাড়াও, কৃষির আধুনিকায়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিতে 'সমন্বিত কৃষি ইউনিট'-এর মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা

করছে। কাউকে বাদ দিয়ে নয়। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সেই মূলমন্ত্র নিয়ে শার্প কাজ করে যাচ্ছে।

বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তিস্তা অববাহিকার চরাঞ্চলে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষগুলো নানাভাবেই বঞ্চিত ও অবহেলিত। এছাড়াও, সরকারি বিভিন্ন সেবা ও সুযোগে অভিগম্যতাও খুবই সীমিত। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে পীঁড়িত এই অঞ্চলে বাল্যবিয়ে, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন, জেন্ডার বৈষম্যসহ নানান ধরনের কুসংস্কার ও অসঙ্গতি সমাজে আষ্টেপৃষ্টে লেগে আছে। এ সমস্যাসমূহের উত্তরণে পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে শার্প এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কাজ করছে।

ফলে এই অঞ্চলেও এখন পরিবর্তনের হাওয়া লাগছে। কৃষির আধুনিকায়ন হচ্ছে। প্রযুক্তির উত্তরোত্তর ব্যবহার ও জলবায়ু সহনশীল কৃষির সাথে অত্র অঞ্চলের মানুষ পরিচিত হতে পারছে। তাদের মধ্যে বাড়ছে স্বাস্থ্য সচেতনতা, কমছে বাল্যবিবাহ। সেই সাথে নারীরা আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পরিবারে অবদান রাখছে। ফলে পরিবারে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবন্ধীদেরকে এখন পরিবার এবং সমাজের বোঝা মনে করা হয় না। সরকারি বিভিন্ন অধিদপ্তরের সাথে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের বিভিন্ন সেবা ও সুযোগে অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শামিল করতে গত দুই দশক ধরে সফলভাবে বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় শার্প এ এলাকায় অনন্য নজির স্থাপন করছে। স্থানীয় জনগণ এখন সকল বাধা অতিক্রম করে অদম্য প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় আমরাও অংশীদার

খোন্দকার খালেদ হাসান
নির্বাহী পরিচালক, পাবনা প্রতিশ্রুতি

একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে পাবনা প্রতিশ্রুতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে। বর্তমানে সংস্থাটি পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর ও রাজশাহী জেলায় বসবাসরত অতিদরিদ্র, অসহায়, পিছিয়ে পড়া, অধিকারবঞ্চিত, ক্ষমতা ও মর্যাদাহীন মানুষের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মর্যাদাসহ তাদের ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে।

পাবনা প্রতিশ্রুতির লক্ষ্য হলো বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানবাধিকার এবং জেন্ডার বিষয়ক সমন্বিত বোধগম্যতা বৃদ্ধি করা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

সংস্থা কর্তৃক প্রণয়নকৃত নানামুখী উন্নয়নবান্ধব উদ্যোগের ফলে কর্ম এলাকার মানুষের জীবনমান ও জীবিকায় এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। সংস্থার চলমান কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ঋণ সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, যুব উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ, লিগ্যাল এইড প্রাপ্তিতে সহায়তা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে পাবনা প্রতিশ্রুতির সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে পিকেএসএফ, স্যাপ বাংলাদেশ, সেইভ দ্যা চিলড্রেন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, রুপান্তর, হেলভেটাস বাংলাদেশ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আমেরিকান এম্বেসি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক, ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ইউএনডিপি, লাইট হাউজ বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য।

পাবনা প্রতিশ্রুতির বর্তমান বিস্তৃতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ব্যাপক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের পেছনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অবদান সবচেয়ে বেশি।

তবে পাবনা প্রতিশ্রুতির বর্তমান বিস্তৃতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ব্যাপক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের পেছনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অবদান সবচেয়ে বেশি। উল্লেখ্য, ২০০৭ সাল থেকে পাবনা প্রতিশ্রুতি পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে আসছে। কর্মএলাকার প্রান্তিক মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়ার সারথি হিসেবে পাবনা প্রতিশ্রুতিকে সুযোগ করে দেওয়ায় আমরা পিকেএসএফ-এর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

পাবনা প্রতিশ্রুতি সততা, দক্ষতা, সুনামের ভিত্তিতে নানামুখী পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যে পথে বিরাজ করছে জনমানবের কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। সুনির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে লক্ষিত

জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, জীবনমান উন্নয়ন, আর্ত মানবতার সেবা ও সামগ্রিক উন্নয়ন এবং পাবনা প্রতিশ্রুতি'র উৎকর্ষ সাধন, নেতৃত্ব ও উদ্ভাবন উন্নয়ন অঙ্গনে বিশেষভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত। এই অর্জন ও গৌরবের সমান অংশীদার তৃণমূল পর্যায়ের সকল উন্নয়ন অংশীদার ও নিবেদিত কর্মীবৃন্দ, যাদের ক্লান্তিহীন শ্রম, ঐকান্তিকতা ও মেহনতি হাতের ছোঁয়ায় পাবনা প্রতিশ্রুতি সুনামের সাথে একটি আদর্শিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং সম্প্রসারিত হয়েছে।

বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ-এর সহায়তায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশীদার হতে পারায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

উপকূলের মানুষের উন্নয়ন সারথি

মোঃ লুৎফর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)

নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) ১৯৮৭ সনে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯২ সনের ২৫ নভেম্বর পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে এনজিএফ পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা ও যশোর জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পিকেএসএফ ১৯৯০ সনে প্রতিষ্ঠা লাভের পর হতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যেমে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যয়ে পিছিয়ে পড়া, পিছিয়ে থাকা এবং পিছিয়ে রাখা অতিদরিদ্র পরিবার, প্রান্তিক কৃষক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও অ-আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর অভূতপূর্ব অবদান আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাদৃত।

এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম উপকূলবর্তী হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও অংশীজনদের আর্থিক কার্যক্রম প্রতিনিয়ত মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গত দেড় দশকে বিশেষত 'সিডর', 'আইলা', 'ফনী', 'বুলবুল', 'আম্ফান', 'ইয়াস', 'সিত্রাং' এবং সর্বশেষ 'রেমাল' আঘাত হানে উপকূলীয় জনপদে। এ সকল ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীকালে পিকেএসএফ আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা-পরিষেবা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত 'নওয়াবেকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)' এবং উপকূলবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে।

> স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকারিভাবে গড়ে ওঠা আমার দেখা স্বচ্ছ ও অনন্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের নাম পিকেএসএফ

পিকেএসএফ ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' পরবর্তীকালে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় সুপেয় পানির অভাব মোচনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে সুপেয় পানি বিতরণ এবং কাজের বিনিময়ে অর্থ যোগানের জন্য 'প্রাইম-৩' শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের অনন্য উদাহরণ এখনো জনগণের হৃদয়ে জ্বল জ্বল করছে। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহযোগিতায় ১৭টি সুপেয় পানির প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৬৮০টি পরিবার প্রতিদিন পানি পান করছে। ভয়াবহ আম্ফান ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীকালে পিকেএসএফ আক্রান্ত এলাকার অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন, পুষ্টির ঘাটতি পূরণ ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রেখেছে।

পিকেএসএফ-এর 'Resililent Homestaed and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)' প্রকল্পটি এনজিএফ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ১০টি উপকূলবর্তী ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের নানাবিধ আর্থিক ও অ-আর্থিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন অব্যাহত থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের ফলে এসব এলাকার বিপর্যস্ত পরিবারগুলি চরম দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের পিছিয়ে পড়া প্রতিটি পরিবার পিকেএসএফ ও এনজিএফ-এর কার্যক্রমে সর্বদা তুষ্ট। লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, পুষ্টি নিরাপত্তা, টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি পিকেএসএফ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমৃদ্ধি, সমন্বিত কৃষি কার্যক্রম, লিফ্‌ট প্রকল্প, রেইজ প্রকল্প, আরএমটিপি, আরএইচএল ও প্রসপারিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান রাখছে।

পিকেএসএফ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনন্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় আমরা গর্ব অনুভব করি। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সরকারিভাবে গড়ে ওঠা আমার দেখা স্বচ্ছ ও অনন্য একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের নাম পিকেএসএফ। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা ও শিষ্ঠাচার চর্চার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ যে নিদর্শন রেখে চলেছে তা আমাদের জন্য সর্বদা অনুকরণীয়। আগামীতে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাহিদার নিরিখে নানাবিধ বৈচিত্র্যময় ক্ষুদ্র অর্থায়নসহ উদ্ভাবনীমূলক চমৎকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে – এই প্রত্যাশা করি। পিকেএসএফ এগিয়ে যাক স্ব-মহিমায়।

এসো'র অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ

মতিনুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো)

পিকেএসএফ শুরু থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগ্য ও দক্ষ জনবল হিসেবে রূপান্তরের কাজ করছে। শৃঙ্খলা, নৈতিক মূল্যবোধ ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহকে পাশে নিয়ে প্রগতির পথে পিকেএসএফ এগিয়ে চলেছে। পিকেএসএফ আমাদের শিখিয়েছে, কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। তৃণমূলের সমস্যা খুঁজে বের করে তাদের জন্য যুগোপযোগী কার্যক্রম নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজে দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তি তৈরির মূলমন্ত্র দিয়েছে পিকেএসএফ।

শৃঙ্খলা, নৈতিক মূল্যবোধ, ও বৈষম্যহীন মানব মর্যাদা সম্পন্ন সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহকে পাশে নিয়ে প্রগতির পথে পিকেএসএফ এগিয়ে চলেছে।

'এসো' ১৯৯৯ সালে সমাজসেবা বিভাগের নিবন্ধন এবং ২০০৮ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির নিবন্ধন লাভ করে। ১৯৯৯ সালে সঞ্চয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ শুরু করে। যাত্রা শুরুর দুই বছরের মধ্যেই সংস্থাটিতে দেখা দেয় আর্থিক সংকট। এই সংকট নিরসনে 'এসো' ২০০২ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। পিকেএসএফ-এর দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ পেয়ে এসো কালের আবর্তে এখন শুধু ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয় বরং এটি দেশের অন্যতম একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে 'এসো' বাংলাদেশের ৫টি জেলায় ৩২৪ জন দক্ষ কর্মীবাহিনী নিয়ে ৩৯,৯৮৫টি পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

কোভিড-১৯ অতিমারি দেশের অর্থনীতিকে স্থবির করে। উক্ত সময় নির্বাহী আদেশে ঋণ কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও সদস্যদের কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ও প্রয়োজনীয় উপকরণ, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ১৭,০০০ পরিবারকে ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ পেয়ারা ও লেবু চারা এবং ২৫,০০০ পরিবারকে সবজির বীজ সরবরাহ করেছে।

'এসো'র কোন সদস্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ১০,০০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা প্রদান করে। এছাড়াও, সংস্থাটি বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সদস্যের সন্তানদের প্রতিমাসে ৩,০০০ টাকা এবং মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত সদস্যের সন্তানদের প্রতিমাসে ৫,০০০ টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছে। বর্তমানে 'এসো' পিকেএসএফ-এর জাগরণ, অগ্রসর (এমডিপি, এমএফসিই, রেইজ) এলআরএল, বুনিয়াদ, সুফলন, কেজিএফ, সমৃদ্ধি, সমন্বিত কৃষি ইউনিট, কৈশোর কর্মসূচি ও প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় (কৃষি খাতে) ২০১৮ জয়পুরহাটে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা হলে তারা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ না করলেও বর্তমানে ব্যাপকভাবে তরমুজ চাষ করছে। 'এসো'র প্রচেষ্টায় বর্তমানে এই এলাকায় ৪০ কোটি টাকার তরমুজের বাণিজ্য হচ্ছে। পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ খাতে 'এসো' জয়পুরহাটে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। ফলে এ এলাকার মুরগি ও পেকিন হাঁসের বাচ্চা পাবনা, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, চুয়াডাঙ্গা ও ঢাকাতে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও, মৎস্য খাতের আওতায় 'রেডি-টু-ইট' মৎস্য পণ্য (ফিশ বল, ফিশ সিঙ্গারা, ফিশ পুরি, ফিশ রোল, ফিশ ফিঙ্গার, ফিশ পাকোড়া) তৈরি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের ফলে সংস্থার সুনাম বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আরো বেগবান হচ্ছে।

আমাদের সংক্ষিপ্ত এ উন্নয়ন যাত্রায় পিকেএসএফ-কে পাশে পেয়েছি সব সময়। পরিশেষে, পিকেএসএফ-এর সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের প্রতি জানাচ্ছি অকুণ্ঠ সমর্থন ও অভিনন্দন!

'পিকেএসএফ দিবস ২০২৪' সফল হোক!

আঠারো বছরের অবিচল সহযোগিতা

মোঃ আসাদুজ্জামান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)

ছাত্রজীবন থেকে স্বপ্ন ছিল অসহায় মানুষের জন্য কাজ করার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে ১৯৮৭ সালে গ্রামীণ ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করি। পরে পানি উন্নয়ন বোর্ড, ব্র্যাক এবং কাজী রফিকুল আলমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে অদ্যাবধি ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সিস্টার কনসার্ন ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছি। মিশনের সাথে পথ চলতে গিয়ে আমার স্বপ্ন পূরণের জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি। অসহায় মানুষের আর্থিক, শিক্ষা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি।

২০০৬ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে এ সংস্থাকে পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষ যেভাবে সহায়তা, তদারকি ও পরামর্শ প্রদান করে আসছে তার অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম ও নানারূপ প্রকল্পের সহায়তায় বর্তমানে আমরা প্রান্তিক শ্রেণির জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করছি। বিশেষ করে সমৃদ্ধি কর্মসূচির চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনের কাছে দৃষ্টি ফিরে পাবার অনুভূতি আমাকে অভিভূত করেছে সবসময়। ঝরেপড়া শিশুদের মাঝে শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া এবং তাদের অভিভাবকদের আর্থিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে পারাও ছিল এক অভাবনীয় সফলতা।

> “বিশেষ করে সমৃদ্ধি কর্মসূচির চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনের কাছে দৃষ্টি ফিরে পাবার অনুভূতি আমাকে অভিভূত করেছে সবসময়।”

উপকূলীয় জেলার বেশিরভাগই লবণাক্ততার প্রভাবে তেমন ফসল হয় না, ফলে এলাকার মানুষের অভাব অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়। এমতাবস্থায় পিকেএসএফ-এর সহায়তায় পটুয়াখালী জেলায় PACE প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসলের জন্য ‘সর্জান’ পদ্ধতিতে উচ্চমূল্যের সবজি, মাছ, সূর্যমুখী, মুগ ডাল এবং তরমুজ চাষ করে প্রান্তিক মানুষ লাভবান হয়েছেন। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও উক্ত এলাকার মানুষ এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এখনও এ সকল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকল্পের সহায়তায় তাদের সফলতা দেখে সত্যিই ভালোলাগার অনুভূতি কাজ করে এবং মনে হয় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি।

কর্মক্ষেত্রে সবসময় চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করেছি। পিকেএসএফ-এর সঠিক তদারকি, সহায়তা ও দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে আরো নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ দিলে ডিএফইডি এগিয়ে যাবে।

দুঃসময়ের পরম বন্ধু পিকেএসএফ

শেখ ইমান আলী
নির্বাহী পরিচালক
সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)

সাতক্ষীরার একদল উদ্যমী তরুণ ১৯৮২ সালে সমাজ উন্নয়নের ব্রত নিয়ে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে, যার নাম ছিলো 'সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'। শুরুতে এলাকার দরিদ্র জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে কাজ শুরু করে এ ক্লাবটি। পরবর্তীকালে, ১৯৮৫ সালে এ ক্লাবটি রেজিস্ট্রেশন পায়। বর্তমানে এটি 'সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা' বা 'সাস' নামে পরিচিত।

১৯৯১ সালে পিকেএসএফ-এর সদস্য হিসেবে 'সাস' অন্তর্ভুক্ত হয়। সে বছরই সংস্থাটি পিকেএসএফ হতে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহযোগিতা পায়। পিকেএসএফ প্রথম যে চেকটি আমাদের প্রদান করে সেই চেকের চুক্তিপত্রে লেখা ছিল 'এই টাকা ফেরত না-ও আসতে পারে'। চেক গ্রহণের সময় মনে হলো, এই টাকা দিয়ে সমস্ত তালাবাসীর দারিদ্র্য বিমোচন করে ফেলবো। সেই থেকে আর পেছনে ফিরে তাকাইনি। পরবর্তীকালে পিকেএসএফ অনেক প্রকল্প ও ঋণ সহায়তা দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় খাপ খাওয়ানো ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করেছে।

> পিকেএসএফ-এর কাছ থেকে প্রথম অনুদান পেলাম। সেখানে লেখা ছিল 'এই টাকা ফেরত না-ও আসতে পারে'। চেক গ্রহণের সময় মনে হলো এই টাকা দিয়ে সমস্ত তালাবাসীর দারিদ্র্য বিমোচন করে ফেলবো।

শুরু থেকেই সংস্থাটি বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি এবং স্বল্প পুঁজি দিয়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টির বিষয়ে 'সাস' প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিতে থাকে। সাস তথাকথিত মহাজনি প্রথার বিপরীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগণের পুঁজি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থায়ন কার্যক্রম হাতে নেয়। পাশাপাশি সংস্থার কাজের পরিধি বাড়লে নিজেদের টাকা ও সদস্যদের চাঁদার মাধ্যমে বাঁশ ও গোলপাতার ছাউনি দিয়ে ঘর নির্মাণ করে। সে অফিসের মাধ্যমে সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা তার যাবতীয় কাজ পরিচালনা করতো। পরবর্তীকালে সংস্থার আকার বাড়লে নতুন অফিস ভবন নির্মাণ করে 'সাস'। আর পুরাতন অফিসটিতে অন্যান্য কার্যক্রম এখনও চালু রেখেছে।

বর্তমানে ১৫টি প্রকল্প ও প্রায় ২০০ কোটি টাকার ঋণস্থিতি রয়েছে আমাদের। বহুতল অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যা পিকেএসএফ-এর অবদান। পিকেএসএফ দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি সংস্থার পক্ষ থেকে দুঃসময়ের পরম বন্ধু পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঘাসফুলের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় পিকেএসএফ

আফতাবুর রহমান জাফরী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঘাসফুল

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে যাচ্ছে ঘাসফুল। পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুলের কার্যক্রম আরো বেগবান হয়েছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে ঘাসফুল ২০০৪ সালে যাত্রা শুরু করে। পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য কাজের ক্ষেত্রগুলো হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কমিউনিটি উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ এবং ভ্যালুচেইন উন্নয়ন ইত্যাদি।

> পিকেএসএফ-এর সাথে কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রতিষ্ঠানটির সহযোগী সংস্থা হওয়ায় দেশি ও বিদেশি দাতা সংস্থার কাছে ঘাসফুলের একটি ইতিবাচক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে।

ঘাসফুল পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিট, PACE (Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises Project) এবং SEP (Sustainable Enterprise Project)-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের মানসম্মত কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিভিন্ন দেশে রপ্তানির বিষয়ে কাজ করেছে। তাছাড়া, পিকেএসএফ-এর সহায়তায় আন্তর্জাতিক বাজারে স্বতন্ত্র ব্র্যান্ডের মর্যাদাও পেয়েছে এ সকল প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য। তাছাড়া, RMTP (Rural Microenterprise Transformation Project) প্রকল্পের মাধ্যমে 'নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন' শীর্ষক ভ্যালুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প সফল বাস্তবায়ন করছে সংস্থাটি।

পিকেএসএফ-এর ECCCP-Drought (Extended Community Climate Change Project-Drought) প্রকল্পটির আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবিলায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে ঘাসফুল। World Bank ও Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-এর আর্থিক সহায়তায় সংস্থাটি Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project বাস্তবায়ন করছে, যার মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবিলায় ঘাসফুল তাদের কর্মএলাকায় পিকেএসএফ-এর লাইভলিহুড রিস্টোরেশন লোন (এলআরএল) কার্যক্রমটি পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে উদ্যোক্তারা ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা কেটে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারী উদ্যোক্তা তৈরি ঘাসফুলের একটি অন্যতম কাজ। বর্তমানে এই নারী উদ্যোক্তারা বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং,

ব্যবসায়ী-চেম্বারসহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। একই সাথে পিছিয়ে থাকা অন্যান্য নারীদের সরাসরি উদ্বুদ্ধও করছেন তারা।

এসব উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ঘাসফুলের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির পাশাপাশি নিজস্ব দক্ষতা এবং সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পিকেএসএফ-এর সাথে কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রতিষ্ঠানটির সহযোগী সংস্থা হওয়ায় দেশি ও বিদেশি দাতা সংস্থার কাছে ঘাসফুলের একটি ইতিবাচক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে হাটহাজারী ও নওগাঁ উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের প্রায় ৮৫০০ শিশুর গুণগত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও তৃণমূলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রেখেছে ঘাসফুল।

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখে চলেছে। ঘাসফুলের পক্ষ হতে পিকেএসএফ দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পিকেএসএফ-এর সাথে পথচলার ৩১ বছর

মোঃ সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

প্রতিষ্ঠার আট বছর পর ১৯৯৩ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় 'সাগরিকা'। প্রথমে পিকেএসএফ-এর কাছ থেকে পাওয়া এক লক্ষ টাকার ফান্ড ১০০ জন ঋণীর মাঝে বিতরণ করে সংস্থাটি। এরপর ২০০৮ সালে বাংলাদেশ সরকারের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথোরীটি থেকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনার রেজিস্ট্রেশন পায় 'সাগরিকা'।

সাগরিকা'র কার্যক্রমগুলোর বেশিরভাগের সাথেই পিকেএসএফ-এর সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারগুলো সহজ শর্তে সাগরিকার কাছ থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়েছে।

দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অগ্রসর ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সদস্য পরিবারগুলো বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে নতুন নতুন উদ্যোগ হতে নেয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা থেকে তারা মাঝারি ও বড় উদ্যোক্তায় (কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও ব্যবসা উদ্যোগ) পরিণত হয়। পিকেএসএফ-এর সহায়তায় উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ ও বিভিন্ন ফল ও ফসলের জাত সম্প্রসারণ করে এলাকায় কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে সাগরিকার সদস্যরা। এই সহায়তা শুধু আর্থিক সক্ষমতা নয়, ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানের পথকেও প্রশস্ত করেছে। গৃহায়ণ ও আবাসন ঋণ সহায়তা নিয়ে নিজেদের বসত ঘরও নির্মাণ করছেন অনেক সদস্য। সাগরিকার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সফলতার একটি বড় অবদান নারীদের। সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন তাঁরা। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের জন্য কাজ করে আসছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে সাগরিকা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার আগাম প্রস্তুতি এবং পূর্বাভাষকালীন দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করছে।

পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির দর্শন অনুযায়ী সংস্থার ২টি ইউনিয়নে সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- সমৃদ্ধ বাড়ি প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা কর্মসূচি, স্যানিটেশন, হাতধোয়া, প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা, বিশেষ ঋণ, আয়বর্ধনমূলক কাজের প্রশিক্ষণ, উদ্যমী সদস্য পুর্নবাসন, মৃতের সৎকারের মতো কাজ বাস্তবায়ন করছে। সত্যিকারের সমৃদ্ধি এসেছে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর জীবনে। সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ-এর শিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে দেশব্যাপী হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এই উদ্যোগকে চলমান রাখতে সাগরিকা তার নিজস্ব অর্থায়নে শিক্ষাবৃত্তি চালু করেছে। শুধু শিক্ষিত নয় একজন মননশীল ও মানবিক মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের জন্য সংগীত এবং নৃত্য শিক্ষার স্কুলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

পিকেএসএফ দিবস উদযাপন ২০২৪ উপলক্ষ্যে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে রইলো আন্তরিক অভিনন্দন। পিকেএসএফ-এর পথচলা আরো মসৃণ হোক।

পিকেএসএফ-এর গৌরবময় যাত্রায় 'বাস্তব'

রুহি দাস
নির্বাহী পরিচালক
বাস্তব-ইনিশিয়েটিভ ফর পিপলস সেলফ ডেভেলপমেন্ট

পিকেএসএফ-এর সাথে বাস্তব-ইনিশিয়েটিভ ফর পিপলস সেলফ ডেভেলপমেন্ট-এর পথচলার ১৫ বছর পূর্ণ হলো এ বছর। বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৫ বছরে সফলতার দিকে এগিয়েছে এই অংশীদারিত্ব। ২০০৭ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার স্বীকৃতি পাওয়ার পর স্ব-কর্মসংস্থান এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ থেকে সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি, সব ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নেই পিকেএসএফ-এর সহযোগী ছিল 'বাস্তব'। এই সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

'বাস্তব' বিশ্বাস করে, জনগণ নিজেই তার সমস্যা চিহ্নিত করতে, সমাধান এবং আত্মোন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম। আর এই সক্ষমতার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যেই ১৯৯৭ সালের ৪ জুলাই সমমনা কিছু নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মীর হাত ধরে সূচনা ঘটে 'বাস্তব' এর। বর্তমানে সংস্থাটি ৭১টি শাখা অফিস এবং পাঁচ শতাধিক কর্মীর মাধ্যমে এক লাখেরও বেশি দরিদ্র পরিবারের সাথে সরাসরি কাজ করছে।

বর্তমানে বাস্তব এবং পিকেএসএফ-এর যৌথ উদ্যোগে RHL (Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh), RAISE (Recovery And Advancement of Informal Sector Employment), SEP (Sustainable Enterprise Project), সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র মতো প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, কৈশোর কর্মসূচির মতো বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে একসাথে কাজ করছে দুটি প্রতিষ্ঠান।

> পিকেএসএফের গঠনমূলক দিকনির্দেশনা সনাতন ধারার ঐতিহ্যবাহী ওয়ার্কশপগুলোকে পরিবেশগত মানদণ্ড অনুসরণকারী মডেল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলেছে। পাশাপাশি প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বয়স্কভাতা প্রদান, স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিক হতে স্বাস্থ্যসেবা ও আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে পরিবেশ টেকসহিতা রক্ষায় একটি সমন্বিত উদ্যোগ SEP (Sustainable Enterprise Project)। এ প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাস্তব কেরানীগঞ্জ, ধোনিয়া এবং ধোলাইখাল এলাকায় উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সাধারণ পরিষেবা, বিপণন সম্প্রসারণ, ইকো-লেভেলিং শীর্ষক কার্যক্রমসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করেছে। এলাকাভেদে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্পৃক্ততার কারণে লক্ষিত এলাকায় প্রকল্প

বাস্তবায়ন কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হলেও পিকেএসএফ-এর পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনার মাধ্যমে, বাস্তব প্রকল্প কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাস্তব শুধু ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোক্তার দক্ষতা বৃদ্ধি করেনি বরং পরিবেশগত দায়িত্ববোধও তৈরি করেছে। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর গঠনমূলক দিকনির্দেশনা সনাতন ধারার ঐতিহ্যবাহী ওয়ার্কশপগুলোকে পরিবেশগত মানদণ্ড অনুসরণকারী মডেল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এর অনন্য উদাহরণ হলো বিভিন্ন ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের মতো ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহ।

RHL প্রকল্পে জলবায়ু সহনশীল টেকসই আবাসন এবং জীবিকা প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু-অভিযোজিত উপকূলীয় এলাকার উন্নয়নে কাজ করছে। এছাড়াও 'বাস্তব' নিরাপদ অভিবাসন, উন্নত স্বাস্থ্য সেবায় 'বাস্তব' হেলথ কেয়ার, কুষ্ঠ প্রতিরোধে লার্নিং ৩৬০, দুস্থ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বাস্তব ও পিকেএসএফ-এর যৌথ প্রচেষ্টা শুধু জনগোষ্ঠীর ব্যক্তি জীবন নয়, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। পিকেএসএফ-এর ক্রমাগত সহযোগিতায় বাস্তব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্বাবলম্বীকরণে আগামীতেও কাজ করবে।

শুভ হোক পিকেএসএফ দিবস ২০২৪।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় নবলোক-এর অগ্রযাত্রা

কাজী রাজীব ইকবাল
নির্বাহী পরিচালক, নবলোক পরিষদ

বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষের জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন ও অধিকার নিশ্চিত করা এবং দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে একটি স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে নবলোক পরিষদ-এর যাত্রা শুরু হয়। এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়নকামী কাজী ওয়াহিদুজ্জামান এবং একদল নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মীর হাত ধরে ১৯৮৬ সালে খুলনা জেলায় নবলোক পরিষদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নবলোক পরিষদ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, আর্থিক অনুদান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

> বাংলাদেশ সরকার যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিল, পিকেএসএফ তা সফলভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নবলোক ১৯৯৫ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করার জন্য আবেদন করে। ১৯৯৬ সালে পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা নবলোক পরিষদ-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা যাচাই করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কিছু দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। নবলোক এসব পরামর্শকে সংস্থার পরবর্তী কৌশলগত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে তা বাস্তবায়নে বিচক্ষণতার সাথে অগ্রসর হতে থাকে।

পরবর্তীকালে পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা ও পরামর্শগুলো বাস্তবায়ন করে নবলোক ২০০১ সালে পুনরায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হওয়ার জন্য আবেদন করে। পিকেএসএফ তা যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ২০০১ সালে নবলোক পরিষদকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে নির্বাচিত করে। ঐ বছর পিকেএসএফ সংস্থার অনুকূলে এক লক্ষ টাকা তহবিল মঞ্জুর করে, যা দিয়ে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় নবলোক-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।

সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর সংস্থার কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এবং দিকনির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে নবলোক সবসময় পিকেএসএফ-কে পাশে পেয়েছে। সহযোগী সংস্থা নির্বাচিত হবার পর থেকে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের নিয়মিত পরিদর্শন, সংস্থাকে সু-সংহত করতে তাদের সহায়ক ও ইতিবাচক মনোভাব, মোটর সাইকেলে চড়ে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত গিয়ে তাদের নিবিড় তত্ত্বাবধান, এ বিষয়গুলো নবলোক-এর কাঠামোকে এবং কর্মীবাহিনীকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করেছে। পরবর্তীকালে, পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ মহোদয়ের পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ সর্বপ্রথম ফকিরহাট শাখায় চিংড়ি চাষে সুফলন ঋণ প্রদান করে। এভাবে পিকেএসএফ-এর সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শে নবলোক-এর কাজের পরিধি ও আর্থিক

সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দক্ষ জনবল সৃষ্টি হয়েছে এবং কাজের গুণগত মান বেড়েছে।

প্রকল্পের ওপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সংস্থার নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতা তৈরির জন্য পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সময় ফকিরহাট এবং সিএন্ডবি শাখায় ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করে কার্যক্রমের অগ্রগতির রোড-ম্যাপ তৈরি করেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। তাদের নিবিড় পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, পরামর্শ, সহযোগিতা এবং সংস্থার দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে উত্তরণের কৌশল নির্ধারণ করে দেয়ার ফলে নবলোক আজ ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানে ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমের এক নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল যা বর্তমানে আরো বেগবান হচ্ছে। জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়ন হলো এর মূলধারা, যার সাথে নবলোক খুব সহজে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেদের কার্যক্রমকে অভিযোজিত করেছে। ফলে পিকেএসএফ ঋণ কার্যক্রমে আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পেও আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। নবলোক পরিষদ-এর সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি পিকেএসএফ-এর সময়োপযোগী পরামর্শ ও সহযোগিতার ফলে সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় নবলোক পরিষদ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। "নবলোক-এর উদ্যোগ কৃষি বান্ধব বিনিয়োগ", "ক্লাস্টারভিত্তিক কৃষি করি, নতুন নতুন উদ্যোক্তা গড়ি" এ শ্লোগানগুলো বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জনপ্রিয় শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। পিকেএসএফ-এর নিবিড় পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও সু-পরামর্শের মাধ্যমে নবলোক পরিষদ পিকেএসএফ-এর আটটি প্রকল্প ইতোমধ্যে দক্ষতা ও সুনামের সাথে সম্পন্ন করেছে।

নবলোক মাত্র দুইটি শাখা থেকে সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে ৪৪টি শাখা এবং ১১টি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৫টি জেলায় ঋণ কার্যক্রম ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জুন ২০২৪ সময়কাল পর্যন্ত পিকেএসএফ নবলোক পরিষদ-কে ৪৩২,১৯,৫০,০০০ টাকা তহবিল প্রদান করেছে। পিকেএসএফ ছাড়াও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় নবলোক বর্তমানে ৯টি প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মএলাকার প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং বেকার যুবক ও যুবতীদের বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে তৈরি করে তাদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে, ক্ষুদ্রঋণের আওতায় ঋণ গ্রহণ করে তারা আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন। "দারিদ্রমুক্ত সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠন"-এর পথে নবলোক পরিষদ-এর এ অগ্রযাত্রা পিকেএসএফ-এর সহায়তা ছাড়া কঠিন হতো বলে আমাদের বিশ্বাস।

কেবল নবলোক নয়, দেশের সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য পিকেএসএফ একটি আশার আলো। এ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সহজ শর্তে এবং নামমাত্র সেবামূল্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে তহবিল সহযোগিতা দিয়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অসামান্য ভূমিকা রাখছে। পিকেএসএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের চাকা ঘুরিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, যা দেশের জিডিপির উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ সরকার যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিল, পিকেএসএফ তা সফলভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সুদক্ষ কর্মকর্তা ও যথোপযুক্ত নেতৃত্বের মাধ্যমে পিকেএসএফ আজ বিশ্বের দরবারে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য স্বায়ত্তশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

আর্থিক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যে পিকেএসএফ-এর বেশ কয়েকটি কাজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসা অর্জন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত জলবায়ু অভিযোজন তহবিল পিকেএসএফ-কে বাংলাদেশে 'জাতীয় বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান' হিসেবে নির্বাচিত করেছে। এছাড়া, পিকেএসএফ বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলের জন্য সুনির্দিষ্ট আর্থিক ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি-এর মূলমন্ত্র 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' অর্জনের পথ সুগম করছে। পিকেএসএফ-এর এ সকল অর্জনে সহযোগী সংস্থা হিসেবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উন্নয়নে অংশীদার হতে পেরে নবলোক পরিষদ অত্যন্ত আনন্দিত। আগামী দিনগুলোতেও এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

টেকসই উন্নয়নের বৈশ্বিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের আঞ্চলিক প্রচেষ্টা

সামছুল হক
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক
সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)

সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই) একটি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৩ সালে ঢাকার অদূরে ধামরাই উপজেলার শ্রীরামপুর-সুতিপাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার নেতৃত্বে জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিকসহ কয়েকজন সমমনা সমাজ সচেতন সঙ্গীর একান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। এসডিআই-এর লক্ষ্য হলো, দেশের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মানব মর্যাদার উন্নয়ন সাধন করা।

এসডিআই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষত নদী অববাহিকায় এবং বন্যাপ্রবণ ও উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৩১ বছর যাবৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ঋণ সেবামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অন্যতম সহযোগী সংস্থা হিসেবে বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসহ দেশের ১৬টি জেলার ১০৩টি উপজেলায় ১০৮টি শাখার মাধ্যমে ঋণসেবা কার্যক্রম এবং ১৪টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

> দরিদ্র মানুষ যদি নিজেদের সক্ষমতা বিকাশের সুযোগ এবং সে অনুযায়ী কাজের অনুকূল পরিবেশ পায় তাহলে তারা সহজেই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

এসডিআই-এর পরিচালনায় বর্তমানে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, নিরাপদ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মানবিক ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রবীণ ও কিশোর-কিশোরীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিকসহ নানাবিধ বিষয়ে ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়নে বৈশ্বিক অঙ্গীকার তথা এসডিজি এবং বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে, যুব শক্তিকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজে লাগিয়ে আমরা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

এসডিআই-এর ঋণ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে তাদের ডিজিটাল টেকনোলজি সরবরাহ ও ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। অতিদরিদ্রদের জন্য ঋণ কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করে তাদের বিনিয়োগের সক্ষমতাও বাড়ানো হচ্ছে।

দীর্ঘ আড়াই যুগের বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, দরিদ্র মানুষ যদি নিজেদের সক্ষমতা বিকাশের সুযোগ এবং সে অনুযায়ী কাজের অনুকূল পরিবেশ পায় তাহলে তারা সহজেই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষত, নারী বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যেও যারা পিছিয়ে তারা অতিসামান্য পুঁজিকে

অবলম্বন করেই তাদের জীবন ও জীবিকায়ন চালিয়ে নিতে পারে। এজন্য তাদের শুধু প্রয়োজন প্রারম্ভিক পুঁজি, কারিগরি দক্ষতা, বাজারের সাথে সংযোগ এবং চলাচল ও পরিবহনের জন্য উন্নত রাস্তা ও বাহন; আর কিছু নয়।

মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা, স্থানীয় মানুষের জ্ঞান এবং স্থানীয় সম্পদের সমন্বয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমেই এসডিআই আজ একটি সৃজনশীল সংগঠন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সন্দ্বীপ এবং উড়ির চর-এর মতো দুর্গম এলাকায় আমরা শীর্ষস্থানীয় এনজিও হিসেবে কাজ করছি।

এসডিআই বর্তমানে নিরাপদ সবজি চাষ, কৃষিতে গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (গ্যাপ), নিরাপদ মাংস এবং দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, নিরাপদ পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালন, নারীদেরকে আয়মুখী কাজে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরির মতো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

একটি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত থেকে মানুষের প্রয়োজনে কাজ করা এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পেরে এসডিআই কৃতজ্ঞ। পিকেএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এসডিআই-এর পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

কর্মসৃজনে দারিদ্র্য বিমোচন: পিকেএসএফ ও স্যাপ-এর যৌথ যাত্রা

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ (স্যাপ)-বাংলাদেশ

১৯৮৯ সালের ১৩ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতি বছর এ দিনটিকে 'পিকেএসএফ দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করছে। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশের সুযোগ পেয়ে 'সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ (স্যাপ)-বাংলাদেশ' খুবই আনন্দিত।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন আর্থিক, অ-আর্থিক এবং কারিগরি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসৃজনের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলাসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য বিমোচনে সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর অবদান আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

পিকেএসএফ একঝাঁক দক্ষ, অভিজ্ঞ, কর্মঠ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর প্রচেষ্টায় বিভিন্ন নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনুকরণীয় সফলতার পরিচয় দিয়ে আসছে।

স্যাপ-বাংলাদেশ ১৯৮৭ সালে দুর্যোগপ্রবণ সমুদ্র উপকূল ও চরাঞ্চলে দুইটি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। সংস্থাটি ২০০৪ সাল থেকে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে আসছে এবং বর্তমানে ২৬টি শাখার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই শাখাগুলো দুর্যোগপ্রবণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। বিগত সময়ে সিডর, আইলা, কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, যুদ্ধবিগ্রহ, বৈশ্বিক মন্দা ইত্যাদি কারণে স্যাপ-বাংলাদেশ-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হলেও, পিকেএসএফ-এর সার্বিক সহযোগিতায় সংস্থাটি এ সকল সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, অন্তর্ভুক্তি, গুণগতমান এবং অব্যাহত সহযোগিতা নিশ্চিত করে সহযোগী সংস্থার কার্যক্রমের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ একঝাঁক দক্ষ, অভিজ্ঞ, কর্মঠ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর প্রচেষ্টায় বিভিন্ন নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনুকরণীয় সফলতার পরিচয় দিয়ে আসছে। পিকেএসএফ দুর্নীতিমুক্ত কর্ম-পরিবেশে ও কার্যকর অংশীদারত্বের ভিত্তিতে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে যেকোনো কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। এজন্য, পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে সহযোগী

সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, নিয়মিত সভা, কার্যক্রম মনিটরিং এবং অডিটের মাধ্যমে সবল ও দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তা কাটিয়ে ওঠারও পরামর্শ দেয়া হয়।

পিকেএসএফ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বিশ্বাসী এবং এর মূল ভিত্তি হলো 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' অর্থাৎ সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে পিকেএসএফ সকল শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মানুষ যেমন, নারী, পুরুষ, যুবক, যুবতী, শিশু, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, হিজড়াসহ অন্যান্য সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফলে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সারা দেশে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তা সকলের কাছে দৃশ্যমান ও সমাদৃত হচ্ছে। স্যাপ-বাংলাদেশ পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পেরে আনন্দিত এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

বাধা আসবে, তবু যেতে হবে বহুদূর

মোঃ কামাল উদ্দিন
নির্বাহী পরিচালক, পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ৩৫ বছরে পদার্পণ করায় পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। ১৩ নভেম্বর পিকেএসএফ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ প্রকাশনার মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর বহুমুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং উন্নয়ন ভাবনা সম্পর্কে জানতে আমি আগ্রহভরে অপেক্ষা করছি।

১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)' ভোলা জেলার একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি ১৯৯২ সাল থেকে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দীর্ঘ এই পথচলায় পিকেএসএফ সর্বদা এফডিএ-এর পাশে থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার পাশাপাশি মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে আসছে।

দুর্গম এলাকায় শিক্ষার প্রসারের জন্য এফডিএ-এর উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভোলা দেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা। নদীবেষ্টিত এ জেলার অধিকাংশ মানুষের জীবন ও জীবিকা নদীকেন্দ্রিক। কৃষি ও মৎস্যনির্ভর এ সকল মানুষের জীবন-জীবিকা প্রতিবছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যেমন, অতিজোয়ার, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। তবুও যুগের পর যুগ ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়াই করে বেঁচে আছে এই জনপদের মানুষ। গত তিন দশক ধরে সামগ্রিকভাবে দেশের গড় দারিদ্র্যসীমার হার হ্রাস পেলেও ভোলার নদী তীরবর্তী জনগণের কিয়দংশ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। এ প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য নিরসনে পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এফডিএ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করছে। এসব প্রকল্প নদী তীরবর্তী মানুষের টেকসই বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে।

নিজ পরিশ্রম এবং পিকেএসএফ ও এফডিএ-এর কার্যকর উদ্যোগ ও পরামর্শে এ অঞ্চলের অতিদরিদ্র সদস্যরা নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলছেন। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য যেন সহজে বিপণন করা যায় সেজন্য সংস্থার উদ্যোগে 'বাজার সংযোগ' কার্যক্রমও চলমান আছে। এছাড়াও, অতিদরিদ্র সদস্যদের আয়ক্ষয় রোধ এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে এফডিএ মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে, যা সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের উন্নতিতে অবদান রাখছে।

দুর্গম এলাকায় শিক্ষার প্রসারের জন্য এফডিএ-এর উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ শিক্ষা কার্যক্রমের ফলে শিশু ও অভিভাবকদের শিক্ষার

প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার কমছে, যা স্থানীয় জনগণের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

অতিদরিদ্র সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি তাদের সক্ষমতা ও অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও পিকেএসএফ ভবিষ্যতে আরো উদ্যোগী হবে বলে আমরা আশাবাদী। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে এফডিএ-এর পাশে থাকার জন্য পিকেএসএফ-এর প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রবীণদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি এবং কর্মময় বার্ধক্যের সম্পর্ক

আবুল হাসিব খান
নির্বাহী পরিচালক
রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্রঋণের গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। ১৯৮১ সালে 'রিক' যাত্রা শুরু করেছিল দুর্যোগ কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে। এই পথ চলায় 'রিক' চলতে গিয়ে উপলব্ধি করেছে যে, শুধুমাত্র সাময়িক ত্রাণ সাহায্য দিয়ে দরিদ্র এবং অসহায় মানুষের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। দারিদ্র্য দূর করার প্রথম শর্ত হলো মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং অধিকার অর্জনে তাদেরকে প্রস্তুত করে তোলা। এই উপলব্ধি থেকে দুর্যোগ ও বিপর্যয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি রিক শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম।

রিক দীর্ঘদিন প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যে, প্রবীণদের আজীবন অর্জিত অভিজ্ঞতা দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এই ধারাবাহিকতায় নিম্ন আয়ের মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শুরু হয় তৃণমূল পর্যায়ে জনসংগঠন তৈরির কাজ। তাদেরকে বিকল্প আয় উপার্জনের জন্য তৈরি করার লক্ষ্যে শুরু হয় প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে আয় উপার্জনের জন্য ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম। ক্রমান্বয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয় উপার্জনের উপাদান হিসেবে ক্ষুদ্রঋণের চাহিদা বাড়তে থাকায় ১৯৯১ সালে 'রিক' পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।

'রিক' এই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পথ চলায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে শিশুদের তুলে আনতে তাদের অভিভাবকদেরকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়েছে। অতি-দরিদ্রদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৩ সালে রিক CGAP (Consultative Group to Assist the Poor)-এর Pro-Poor Innovative Challenges শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল ২০২২ সালে বলেছে যে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ৬০ বা তার বেশি বয়সি মানুষের সংখ্যা হবে ৩.৬ কোটি যা মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নে এই বিপুল জনসংখ্যার প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান সুরক্ষিত রাখা হবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করলেও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গৃহীত সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রবীণদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়না। প্রবীণরা দারিদ্র্য

বিমোচন কর্মকাণ্ডে কোনো ভূমিকা রাখতে অক্ষম এ ধরনের একটি ধারণা থেকে তাদেরকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কোনো প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হয় না।

প্রকৃতপক্ষে বাস্তব অবস্থা একেবারেই ভিন্ন। 'রিক' দীর্ঘদিন প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যে, প্রবীণদের আজীবন অর্জিত অভিজ্ঞতা দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ১৯৮৯ সালে রিক-এর মাধ্যমে নরসিংদী জেলার জিনারদী ইউনিয়নের ১৫০ জন প্রবীণ সদস্য নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে দেখা গেছে যে, প্রবীণরা সফলভাবে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহার করে পারিবারিক আয় উপার্জনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম, যা সার্বিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

পর্যায়ক্রমে অনুশীলনের মাধ্যমে রিক প্রবীণদের নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে দক্ষ হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রবীণদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য পিকেএসএফ-এর কর্মসূচির আওতায় 'প্রবীণদের জন্য বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম' শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশের ১২টি জেলার ২১টি উপজেলার ৩৪টি শাখার আওতায় ১৩,৫০০ প্রবীণ এই ঋণ ব্যবহার করে সফলভাবে আয় উপার্জনে ভূমিকা রেখে চলেছে। যেহেতু পিকেএসএফ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সমাজ উন্নয়নকে নীতিগতভাবে বিশ্বাস করে সেহেতু এই কর্মসূচিটি দরিদ্র প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি মানবিক সহায়তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক বলে বিবেচিত হচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রবীণদের উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে যা বার্ধক্যকে উৎপাদনমুখী করার পথ দেখাচ্ছে এবং প্রবীণদের পারিবারিক, সামাজিক, স্থানীয়, সার্বিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার পথ সুগম করছে।

পিকেএসএফ কর্তৃক সামাজিক সুরক্ষায় প্রবীণদের অন্তর্ভুক্তিকরণের ভাবনাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। সেই সাথে আশা করি প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণে এই পদক্ষেপ একটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং তৃণমূল পর্যায়ের প্রবীণসহ সমাজের সকল প্রবীণদের জন্য ইতিবাচক বার্তা বয়ে আনবে।

পিকেএসএফ: টেকসই উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের সারথি

এম. রেজাউল করিম চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, কোস্ট ফাউন্ডেশন

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে অবদান রাখা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার ৩৪ বছর পূর্তিতে পিকেএসএফ দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। পিকেএসএফ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় দুই শতাধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি সদসকে (যাদের অন্তত ৯২% নারী) ঘিরে ঋণ ও জীবনমানে পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনে সরাসরি অবদান রাখছে।

কোস্ট ফাউন্ডেশন জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের উপকূলীয় সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে কাজ করে আসছে। পিকেএসএফ-এর সাথে আমাদের যাত্রা শুরু ২০০১ সাল থেকে। প্রতিষ্ঠানটির কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় বর্তমানে আমরা দেশের ১২টি জেলার ৮৩টি উপজেলায় মোট ১৩০টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ, কৈশোর, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছি।

> পিকেএসএফ-এর PACE এবং SEP প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২ হাজারের বেশি স্থানীয় জেলে, শুঁটকি উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা ও এর সঙ্গে যুক্ত পরিবারসহ ১০ হাজার শ্রমিক, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুঁটকি উৎপাদনের কৌশল, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন, আকর্ষণীয় প্যাকেজিং এবং মান নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা হয়েছে।”

আমাদের উপকূলের প্রায় আড়াই কোটি মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির মুখে রয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় শুঁটকি মাছ ছিলো অল্প কিছু লোকের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। বর্তমানে শুঁটকির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে এটি একটি শিল্পে উন্নীত হয়েছে। পিকেএসএফ-এর PACE এবং SEP প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২ হাজারের বেশি স্থানীয় জেলে, শুঁটকি উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা ও এর সঙ্গে যুক্ত পরিবারসহ ১০ হাজার শ্রমিক, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুঁটকি উৎপাদনের কৌশল, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন, আকর্ষণীয় প্যাকেজিং এবং মান নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কক্সবাজারের পর্যটন শিল্পে পর্যটকদের চাহিদা বিবেচনায় RMTP নিরাপদ পোল্ট্রি প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ হাজার উদ্যোক্তাকে অত্যাধুনিক পোল্ট্রি খামার পরিচালনা, জৈব সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং দেশি মুরগির বাণিজ্যিক চাষের মাধ্যমে আমরা কেবল নিরাপদ, উচ্চমানের পোল্ট্রি পণ্যের অবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করছি না, বরং স্থানীয় পর্যায়ে নতুন প্রজন্মের নারী নেতৃত্ব এবং উদ্যোক্তাও তৈরি করছি।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের হাত ধরে, মোঃ মঈনের মতো কলেজ ছাত্রের দেশি মুরগির খামারের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হয়ে ওঠা, নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনে আমান উল্লাহ সওদাগর ও আজিজ উদ্দিনের মতো উদ্যোক্তা জাতীয় পুরস্কারের পাশাপাশি নিরাপদ শুঁটকির আন্তর্জাতিক রপ্তানিকারক হয়ে ওঠা, মোহাম্মদ আলীর মতো উদ্যোক্তা কাঁকড়া হ্যাচারি পরিচালনা ও কাঁকড়ার বাণিজ্যিক উৎপাদনে ভূমিকা রেখে চলেছেন। এমন অনেক উদ্যোক্তাই নিজ অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের এই গল্পগুলো আমাদের সাফল্যের পরিমাপক। ভবিষ্যতের দিকে তাকালে আমরা অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখতে পাই। উপকূলীয় এলাকায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের জন্য একটি দারিদ্র্যমুক্ত টেকসই ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত তৈরি করছি।

দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক বিকাশে প্রান্তিক মানুষের কাছে সেবা পৌঁছানোর মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর এই পথচলায় অন্যতম সহযোগী সংস্থা হিসেবে কোস্ট ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পিকেএসএফ-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করি।

জেলেপাড়ার গলি থেকে ফোর্বস ম্যাগাজিনের পাতায়

মোঃ আজাদুল কবির আরজু
নির্বাহী পরিচালক, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু হয় যশোর শহরতলির জেলেপাড়ায়। বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান গুটি গুটি পায়ে যাত্রা শুরু করেছিল, প্রায় অর্ধশতাব্দির পথচলায় আজ সেটি পরিণত হয়েছে একটি মহিরুহ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে।

ক্ষুদ্রঋণে অবদান ও কীর্তির স্বীকৃতি স্বরূপ জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন এখন পর্যন্ত পেয়েছে বেশ কিছু পদক। শ্রেষ্ঠ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০০৫ সালে পাওয়া প্রধানমন্ত্রীর পদক প্রাপ্ত হয় প্রতিষ্ঠানটি। ২০০৭ সালে ফোর্বস ম্যাগাজিন বিশ্বের মধ্যে ১৬শ এবং বাংলাদেশের মধ্যে ২য় সেরা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেটিং প্রদান করে। এছাড়াও, ২০০৯ সালে মাদার তেরেসা রিসার্চ কাউন্সিলের 'মাদার তেরেসা গোল্ড মেডেল' এবং ২০১০ সালে সিটি গ্রুপের শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পদক পায় জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন।

> জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ-এর কাছ থেকে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহায়তা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে নানাবিধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে যা সংস্থাকে বিভিন্ন বিষয়ে টেকসই হতে সহায়তা করেছে।

১৯৭৫ পরবর্তী দেশের টালমাটাল সময়ে আমরা সমমনা কয়েকজন মুক্তিযুদ্ধফেরত তরুণ দেশের জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে এক আলোচনার সূত্রপাত করি। পরবর্তীতে বয়স্ক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে 'জাগরণী চক্র' নামে আমাদের কার্যক্রম শুরু হয় যশোর শহরতলির জেলেপাড়ায়। ১৯৭৬ সালে আমাদের প্রতিষ্ঠানটি সাংগঠনিক স্বীকৃতি পায়। পর্যায়ক্রমে সংস্থার কর্মকাণ্ড শিশুশিক্ষা, দল গঠন ও সঞ্চয় কার্যক্রম, আয়মূলক ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ, ঋণদান এবং অন্যান্য কর্মসংস্থান কার্যক্রমে বিস্তৃত হয়। প্রতিষ্ঠার প্রায় পাঁচ বছর পর থেকেই সদস্যদের মধ্যে আয়বর্ধক কাজের জন্য তহবিলের চাহিদা বাড়তে থাকে, তথাপি তৎকালীন দাতা সংস্থার আশ্বাসে সংস্থাটি পুরোদস্তুর ঋণ কর্মসূচিতে আগ্রহ দেখায়নি। এজন্য ১৯৯০ সালে ৩৫০০ জন নারী-পুরুষকে ১২০টি দলে অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের আনুষ্ঠানিক ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৯১ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সরাসরি সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে খুলনা বিভাগের প্রথম সহযোগী সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন। প্রথম পর্যায়ে আনুমানিক ১,৫০০ সদস্যের মাঝে বিতরণের জন্য পিকেএসএফ সর্বমোট এক লক্ষ টাকার তহবিল প্রদান করে এবং একই সাথে খুলনা বিভাগের প্রায় কুড়িটির অধিক ছোটো ছোটো এনজিও'র ঋণ কর্মসূচির প্রাথমিক কাঠামো তৈরিতে জাগরণী চক্র পিকেএসএফ-এর সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

ইত্যবসরে জাগরণী চক্র বিভিন্ন বিদেশি দাতা সংস্থার কয়েকটি প্রকল্প সুনামের সাথে সম্পন্ন করে। এতে করে আমাদের প্রতিষ্ঠানে একঝাঁক দক্ষ জনবল প্রস্তুত হয়। ১৯৯৬/৯৭ সালে সংস্থার এ সকল দিক বিবেচনা করে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থা হিসেবে জাগরণী চক্রের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ ও কর্মএলাকা বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়।

২০০০ সালে সংস্থার প্রধান বিদেশি দাতা সংস্থা তাদের সহায়তার ধরন পরিবর্তন করলে প্রধান কর্মসূচি হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে বেছে নেয়া হয় এবং ২০০৬ সালের দিকে ঋণ কার্যক্রমের কর্মএলাকার বৃহৎ সম্প্রসারণ করা হয়। ২০০৮ সালে প্রথাগত ঋণ কার্যক্রমের বাইরে এসে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় রংপুর জেলায় মঙ্গা নিরসনে Programmed Initiatives for Monga Eradication (PRIME) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যা পরবর্তীতে আরো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশীদারভিত্তিতে কাজের দুয়ার উন্মোচন করে। এরপর জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে দক্ষতা অর্জন ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা, তরুণ জনগোষ্ঠীকে আয়বর্ধক বিভিন্ন কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা দেওয়া, সমন্বিত কমিউনিটি উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই জীবিকা উন্নয়ন, বয়স্ক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, দেশের নবীন জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন বাজার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত করার মতো কাজ বাস্তবায়ন করেছে।

গতানুগতিক উন্নয়ন কার্যক্রমের বাইরে গিয়ে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত জনগোষ্ঠী হরিজনদের নিয়ে কাজ, যৌনকর্মীর সন্তানদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র, দুর্গম অঞ্চলের দরিদ্র শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, গ্রামের নারীদের প্রজননতন্ত্রের সমস্যা সমাধানে বিনামূল্যে অস্ত্রপচার সেবা, নিম্ন আয়ের মানুষ ও নারীদের নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে অবিরাম।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ-এর কাছ থেকে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহায়তা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে নানাবিধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে যা সংস্থাকে বিভিন্ন বিষয়ে টেকসই হতে সহায়তা করেছে। এছাড়াও, এই দীর্ঘ পথ চলায় অভিভাবকের মতো পাশে থেকে পিকেএসএফ আমাদেরকে নিজ পায়ে শক্তভাবে দাঁড়ানোর সাহস ও সক্ষমতা দিয়েছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে মানব সেবার ব্রত গ্রহণ

মোঃ শহীদুল হক
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সোশ্যাল এসিস্ট্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালী ভালনারেবল (এসএআরপিভি)

১৯৮৮ সাল। প্রবল টর্নেডোর আঘাতে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় নেমে আসে মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়। দুর্যোগ আক্রান্ত সাটুরিয়াবাসীর জন্য রাজধানী ঢাকায় বসেও কিছু মানুষ মর্মপীড়া অনুভব করেন। তাদেরই একজন তৎকালীন তরুণ ব্যাংকার মোঃ শহীদুল হক। তিনি ও তার কয়েকজন সুহৃদ দুর্যোগে সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন সেই টর্নেডো বিধ্বস্ত জনপদে। হঠাৎ একদিন এক কিশোরী এসে শহীদুল হককে বললো "যাগো ঘর বাড়ি গ্যাছে তাগোরে আপনারা ঘর বাড়ি বানায় দেন, যাগো খাওন নাই তাগোরে আপনারা খাওন দেন, আর আমার যে একটা পাও গ্যাছেগা আমার পাওডা কি ফেরত দিতে পারবেন?" এই প্রশ্নে তিনি হতবিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকেন মেয়েটির দিকে। কেবল এই একটি মাত্র প্রশ্নই তার মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে, কারণ তিনি নিজেও শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার।

> "যাগো ঘর বাড়ি গ্যাছে তাগোরে আপনারা ঘর বাড়ি বানায় দেন, যাগো খাওন নাই তাগোরে আপনারা খাওন দেন, আর আমার যে একটা পাও গ্যাছেগা আমার পাওডা কি ফেরত দিতে পারবেন?"

সেই থেকে প্রতিবন্ধী মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন সোশ্যাল এসিস্ট্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালী ভালনারেবল সংক্ষেপে এসএআরপিভি। অত্র সংস্থা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্রে রেখে তৃণমূল জনগণের অধিকার, অ্যাডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, একীভূত শিক্ষা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ, নবায়নযোগ্য শক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

২২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে এই সংস্থাকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সহোযাগী সংস্থা হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করে। সেই থেকেই পিকেএসএফ-এর সাথে আমাদের যাত্রা শুরু। আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি পিকেএসএফ এ প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ এবং জবাবদিহিতামূলক সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমৃদ্ধ করেছে।

বিগত সাত বছরে সংস্থাটি মাঠপর্যায়ে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ অতিমারি চলাকালে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বহুমাত্রিক পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত প্রশংসামূলক। সে সময় সকল সহযোগী সংস্থার ন্যায় এই সংস্থাও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের অংশীদার হতে পেরে গৌরব বোধ করছে। তৎকালীন অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য অতি নিম্ন সার্ভিস চার্জে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা করেছে, যার

সুফল আজ অবধি সদস্যরা ভোগ করছে। এছাড়া, অত্র সংস্থা পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে 'মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি' প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ, লোহাগাড়া, বাঁশখালী, সাতকানিয়া উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রাপ্যতা নিশ্চিতে কাজ করছে। এছাড়াও, 'রেসিলিয়েন্ট হোমস্টেড অ্যান্ড লাইভলিহুড সাপোর্ট টু দ্যা ভালনারেবল কোস্টাল পিপল অফ বাংলাদেশ (আরএইচএল)' প্রকল্পের মাধ্যমে চকরিয়া উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর বসতভিটা এবং জীবিকায়নের মান উন্নয়নে অত্র সংস্থা নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

সহযোগী সংস্থাসমূহের সার্বিক উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ-এর কার্যকর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রেখে সংস্থাটিকে একটি আদর্শ সংস্থায় রূপান্তরিত করে এর কর্মপরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সার্বিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনায় আমরা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবো বলে বিশ্বাস করি।

স্মৃতির পাতা থেকে...

ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং গ্রামীণ ব্যাংক-এর নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ; ফেব্রুয়ারি ২০০৭

ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং গ্রামীণ ব্যাংক-এর নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ; ফেব্রুয়ারি ২০০৭

নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ; ফেব্রুয়ারি ২০০৭

২০০৪ সালে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত Asia Pacific Regional Microcredit Summit (APRMS) শীর্ষক অনুষ্ঠানে স্পেনের রাণী ডোনা সোফিয়ার সঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইউনূস; ফেব্রুয়ারি ২০০৪

২০০৪ সালে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত Asia Pacific Regional Microcredit Summit (APRMS) শীর্ষক অনুষ্ঠানে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ; ফেব্রুয়ারি ২০০৪

২০০৪ সালে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত Asia Pacific Regional Microcredit Summit (APRMS) শীর্ষক অনুষ্ঠানে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ; ফেব্রুয়ারি ২০০৪

২০০৪ সালে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত Asia Pacific Regional Microcredit Summit (APRMS) শীর্ষক অনুষ্ঠানে স্টল পরিদর্শন করছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ফার্স্ট লেডি জেনেল ডুমিনি এমবেকি ও ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ; ফেব্রুয়ারি ২০০৪

পিকেএসএফ এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সহযোগী সংস্থা গ্রামাউস কর্তৃক বাস্তবায়িত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন; ১৯৯৮

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন; ২০০৫

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন; ২০০৫

পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত 'উন্নয়ন মেলা ২০০৬'-এ পুরস্কারপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের সাথে ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ;

Microfinance for Marginal and Small Farmers (MFMSF) Project শীর্ষক প্রকল্পের উদ্বোধনী কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এবং ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ; জুলাই ২০০৫

পিকেএসএফ-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ; ২০০৬

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন; ১৯৯৮

সহযোগী সংস্থা গ্রামাউস-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন; ১৯৯৮

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলায় পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ মঙ্গা মিটিগেশন ইনিশিয়েটিভ পাইলট প্রোগ্রাম (MMIPP)-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন; ২০০৫

রংপুর জেলায় সহযোগী সংস্থা আরডিআরএস-এর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ; ২০০৫

ঠাকুরগাঁও জেলায় সহযোগী সংস্থা ইএসডিও-এর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ; ২০০৫

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফখরুদ্দীন আহমদ; জুন ২০০৬

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সালেহউদ্দিন আহমেদসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী; ১৯৯৮

পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত পিকনিকে তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ-এর সাথে অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ঠাকুরগাঁও জেলায় সহযোগী সংস্থা ইএসডিও-এর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ-কে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক; ২০০৫

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পুস্তিকাটির পুনর্মুদ্রণ*

*২০১০ সালে প্রকাশিত পুস্তিকাটি হুবহু মুদ্রণ করা হলো।

ছায়ালিপি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

ছায়ালিপি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নভেম্বর, ২০১০

ডঃ কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রচ্ছদ ঃ পিকেএসএফ ভবন

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল ঃ pksf@pksf-bd.org
ওয়েভ পেইজ ঃ www.pksf-bd.org

নভেম্বর, ২০১০

কম্পোজ ও পেইজ মেক-আপ
মোঃ মনির হাসান, সহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*

ভূমিকা

১.০ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে পিকেএসএফ বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। ফাউন্ডেশনের আদলে বর্তমানে এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে এবং আরো অনেক দেশ এরূপ প্রতিষ্ঠান তৈরিতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে পিকেএসএফ নিজস্ব ভাবমূর্তি ও স্বকীয়তা বজায় রেখে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর নতুন নতুন কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। দাতা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সীমিত সময়ের প্রকল্প হিসেবে নয় বরং একটি স্বশাসিত এবং স্বতন্ত্রধারার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রেক্ষাপট

২.০ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের মধ্যে দীর্ঘদিনের আলাপ আলোচনা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতবিনিময়, স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ এবং দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পার হয়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার এ ইতিবৃত্ত কর্মসৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত উন্নয়ন প্রয়াস চিহ্নিতকরণের ও সেটি বাস্তব রূপ প্রদানের অন্বেষণ প্রক্রিয়ার ইতিহাস। একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সূচিত উক্ত অন্বেষণ প্রক্রিয়া অর্ধযুগব্যাপী চলমান ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সফল পরিসমাপ্তি লাভ করে। উক্ত প্রক্রিয়াভুক্ত চলমান ঘটনা প্রবাহকে লিপিবদ্ধ আকারে ধরে রাখার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছাড়াও ইতিবৃত্তটি দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক, দেশি ও বিদেশি পরিকল্পনাবিদ এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের নিকট উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের একটি অনন্য কেস স্টাডি হিসেবে পরিগণিত হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

৩.০ ১৯৮৪ সালের শুরুতে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প (Poverty Alleviation and Rural Employment Project)-শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ঘটনা প্রবাহের সূত্রপাত হয়ে ১৯৯০ সালের মে মাসে পল্লী

---

* এই পুস্তিকার ৪-৯৪ নং অনুচ্ছেদে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে যে-সকল ঘটনার ক্রমবিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো ফাউন্ডেশনে রক্ষিত কাগজ-পত্র থেকে নেয়া হয়েছে। পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত ঘটনা পরম্পরা বর্ণনায় ফাউন্ডেশন বা ফাউন্ডেশনের কোন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত মতামত জুড়ে দেয়া হয়নি। পুস্তিকাটি পিকেএসএফ-এর ৮ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ প্রণয়ন করেছেন। তাঁকে সাহায্য করেন জনাব রোকনুজ্জামান, তৎকালীন সহকারী ব্যবস্থাপক।

কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক উত্থাপিত প্রাথমিক ধারণাপত্রের সাথে তুলনা করা হলে দেখা যাবে যে, ১৯৯০ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সম্পূর্ণ পৃথক কাঠামো ও আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। ফাউন্ডেশন গঠনের পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হবার জন্যে ধারাবাহিকভাবে ১৯৮৪ সাল থেকে এতসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নিচে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হলো–

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৮৪ সাল

৪.০ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প শীর্ষক প্রস্তাবের অব্যবহিত পরেই প্রকল্প প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিশ্বব্যাংক "Bangladesh: A Framework for Additional Efforts to Address Rural Poverty and Employment" নামে একটি দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের ধারণাপত্র সরকারের বিবেচনার জন্যে পেশ করে। উক্ত ধারণাপত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের কৌশল সমন্বয় করে Upazila Employment Resource Centre (UERC) স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। অধিকন্তু সরকারি কাঠামোর বাইরে একটি বিদেশী বেসরকারি সংস্থাকে UERC কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে বিশ্বব্যাংক প্রস্তাব করে।

৫.০ সরকারের পক্ষ হতে প্রস্তাবিত UERC প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস-এর মতামত চাওয়া হলে তিনি এর বিরোধিতা করে জুন ২৯, ১৯৮৪ সালে লিখিতভাবে তাঁর মতামত প্রদান করেন। তাঁর মতে, গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাকের পরীক্ষিত সফল দু'টি ভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রিত করে একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করলেই সেটি বাস্তবায়ন পর্যায়ে মূল কার্যক্রমগুলোর অনুরূপ সাফল্য বয়ে আনবে তার নিশ্চয়তা নেই। "গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাক দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ সিস্টেম দাঁড় করিয়েছে। এর এক অংশ খুলে নিয়ে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করলে সেটা একইভাবে কার্যকরী হবে এটা ধারণা করাটা বোকামি হবে।" তদুপরি এরকম ক্ষেত্রে চলমান অপর দু'টি কর্মসূচির পরিকল্পিত সম্প্রসারণ ও কাঙ্ক্ষিত কার্যকারিতার ওপর নতুন আবিষ্কৃত প্রকল্পের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তিনি প্রকল্পের রূপরেখা, বিদেশি উপদেষ্টা নিয়োগ, বাংলাদেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব, প্রোগ্রাম কমিটিতে দাতা সংস্থার প্রতিনিধি রাখা ইত্যাদি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি মন্তব্য করেন "মৌলিক দিক থেকে এটি অত্যন্ত দুর্বল প্রকল্প। -----অন্যান্য প্রকল্পের মতোই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার জন্যে অন্যদের দায়ী করেই প্রকল্প রচয়িতারা আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন।"

৬.০ UERC-এর ধারণাপত্র এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনার জন্যে জুলাই ৮, ১৯৮৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম. মাহবুবুজ্জামানের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতামত আলোচিত হয়। বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া ডেস্কের কর্মকর্তা Om P. Nijhawan উক্ত বৈঠকে আলোচিত UERC-এর ধারণাপত্রটি প্রণয়ন করেছেন বলে জানানো হয়। বৈঠকে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস প্রকল্পের ধারণাপত্র সম্বন্ধে ওপরে বর্ণিত তাঁর নেতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, UERC একটি কার্যকরী মডেল নয়। এছাড়া স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনও তাঁদের স্ব স্ব মতামতের ভিত্তিতে UERC প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে।

৭.০ এ বৈঠকে UERC-এর ধারণাপত্রের ওপর আরও গভীরভাবে বিচার বিবেচনা করে একটি কার্যকর মডেল প্রস্তুতের জন্যে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. এ.এইচ.এম শাহদাতউল্লাহকে আহবায়ক করে ৮-সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য উক্ত কমিটিতে অন্যান্যের মধ্যে অর্থ বিভাগের যুগ্ম-সচিব ড. এ.কে.এম. মশিউর রহমানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কমিটি জুলাই ৩১, ১৯৮৪ এর মধ্যে কাজ শেষ করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়।

৮.০ উল্লিখিত কমিটি জুলাই ২৭, ১৯৮৪ তারিখে UERC-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে জুলাই ৩১, ১৯৮৪ তারিখে পুনরায় UERC-এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জুলাই ২৭, ১৯৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্বোল্লিখিত কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়। কমিটির সভাপতি অন্যান্য মন্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত UERC কর্তৃক কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হলে এটি 'atomistically' পরিচালিত হতে হবে। অগণিত গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্যে সরকারকে তত্ত্বগত অবস্থান থেকে সরে এসে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

৯.০ সভায় উপস্থিত অন্যান্যের মধ্যে বিআরডিবি-এর মহাপরিচালক ইরশাদুল হক গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে সরকারকে অতিরিক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে বলে উল্লেখ করে UERC প্রকল্পটি সম্ভাব্য কি কি কারণে ব্যর্থ হবে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন।

১০.০ বৈঠকে UERC-এর ধারণাকে একটি বাস্তবধর্মী মডেলে রূপান্তর করার জন্যে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. এ.এইচ.এম. শাহদাতউল্লাহকে পুনরায় সভাপতি করে ৬-সদস্য বিশিষ্ট অপর একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং আগস্ট ১০, ১৯৮৪ তারিখের মধ্যে কমিটি কাজ শেষ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১১.০ উপরোক্ত কমিটির পরামর্শ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বেই দৃশ্যত বিশ্বব্যাংকের তাগিদে UERC Concept-এর ফলোআপ হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ-এর নেতৃত্বে "Rural Self-Employment Programme" নামে একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর জন্যে একটি Nucleus Project Office স্থাপন করারও সিদ্ধান্ত হয়। ইআরডি (Economic Relations Division-ERD)-কে লিখিত এক পত্রে অক্টোবর ২২, ১৯৮৪ তারিখে মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ জানান যে, বিশ্বব্যাংক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের প্রয়োজনীয় খরচ বহন করবে। ইআরডি-এর নিকট এই প্রকল্পের Technical Assistance Project Proposal (TAPP)-এর অনুমোদন চাওয়া হয়। ইআরডি, প্রস্তাবিত TAPP অনুমোদন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এটি অনুমোদিত হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৮৫ সাল

১২.০ বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৮৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে লিখিত পত্রে জানায় যে, "Rural Self-Employment Project" প্রণয়ন/প্রাক-মূল্যায়নের কাজ করার লক্ষ্যে Om P. Nijhawan-এর নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রাক-মূল্যায়ন মিশন ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৮৫ তারিখ হতে তিন সপ্তাহের জন্যে ঢাকায় আসবে। এ মিশনের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহকে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করার সুযোগ দানের জন্যে অনুরোধ করা হয়।

১৩.০ বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের প্রধান জুন ৩০, ১৯৮৫ তারিখে ইআরডি এবং মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহকে জানান যে, Nucleus Office স্থাপনের জন্যে Technical Assistance (TA) IV-এর আওতায় sub-project ২২-এর অধীনে ১৪,৮৩৬ মার্কিন ডলার মঞ্জুর করা হয়েছে।

১৪.০ জুলাই ৮, ১৯৮৫ তারিখে A. J. Clift, Chief, Bangladesh Division, South Asia Programs Department, World Bank, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম, মাহবুবুজ্জামানকে লিখিত পত্রে জানান যে, ইতোমধ্যে আইডিএ (International Development Association-IDA) প্রস্তাবিত "Rural Non-Farm Employment and Training Project" ফরিদপুর জেলার ৮টি উপজেলা এবং ঝিনাইদহ জেলার ৬টি উপজেলায় তিন ধাপে (Phases I, II, III) বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। Phase-I এ চারটি উপজেলায় এবং Phase-II ও Phase-III-তে ৫টি করে উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উল্লিখিত পত্রে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ সময়ে প্রকল্প মূল্যায়ন মিশন পাঠানোর কথা উল্লেখ করা হয় এবং এর জন্যে Central Project Management Unit (CPMU) স্থাপন ও প্রাক-প্রকল্প কর্মকাণ্ড (Phase-I)-এর জন্যে খরচ (৩০০,০০০ ডলার) ইউএনডিপি প্রদান করবে বলেও উল্লেখ করা হয়। উক্ত পত্রে আইডিএ-কে এ প্রকল্পের Executing Agency হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পত্রে একজন জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাকে জুলাই ১৯৮৫-এর শেষে প্রাক-প্রকল্প কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করার জন্যে ওয়াশিংটন ডিসি-তে গমনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। যেহেতু মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ বক্ষ্যমান বিষয়ে পূর্ব থেকেই সম্পৃক্ত সেজন্যে বিশ্বব্যাংক মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহকে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রেরণ করার সুপারিশ করে।

১৫.০ একই তারিখে (জুলাই ৮, ১৯৮৫) বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত প্রকল্পের Phase-I এর খরচ বাবদ ৩০০,০০০ ডলার অনুমোদনের জন্যে অনুরোধ করে ইউএনডিপি-এর Resident Representative-কে পত্র দেয়। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৮৫ তারিখে প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যায়নের জন্যে বিশ্বব্যাংকের মিশন অক্টোবর ৬, থেকে অক্টোবর ২৪, ১৯৮৫ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করবে বলে ইআরডি-কে অবহিত করে।

১৬.০ বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৮৫ তারিখের পত্রে প্রস্তাবিত প্রকল্পের Preliminary Project Proposal (PPP) দ্রুত পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করে, যাতে করে বিশ্বব্যাংক মিশন ঢাকায় এসে প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে পারে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ ওয়াশিংটন ডিসিতে গমন করেন।

১৭.০ বিশ্বব্যাংক সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৮৫ তারিখের পত্রে সরকারকে প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার আইনগত কাঠামো নির্ধারণ করার জন্যে অনুরোধ করে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর বাইরে কাজ করবে বলেও মত প্রকাশ করা হয়।

১৮.০ প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার আইনগত কাঠামো নির্ধারণের জন্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আনিসুজ্জামান খান-এর সভাপতিত্বে অক্টোবর ৮, ১৯৮৫ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, "Foundation for Rural Employment" শীর্ষক একটি ফাউন্ডেশন স্থাপন করা হবে, যা Societies Registration Act, ১৮৬০ এর আওতায় নিবন্ধন করা হবে। প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডি বা পরিচালনা পর্ষদে সরকারের মাত্র একজন প্রতিনিধি থাকবে। অন্যান্য সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে গভর্নিং বডিতে থাকবেন।

এতে পদাধিকার বলে কোন সরকারি কর্মকর্তা থাকবে না। UERC গুলো প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম হিসাবে বিবেচিত হবে।

১৯.০ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক এস.এইচ.কে. ইউসুফজাই-এর সভাপতিত্বে অক্টোবর ২২, ১৯৮৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের Project Evaluation Committee (PEC)-এর বৈঠকে প্রস্তাবিত Rural Non-Farm Employment and Training Project-এর PP নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের কাঠামোকে কিভাবে সরকারের আমলাতন্ত্রের বাইরে রাখা হবে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। কারণ, প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনে সরকারকে অর্থবছরের প্রথমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে "one-time annual grant" প্রদান করতে হবে, অন্যদিকে ফাউন্ডেশন হবে একটি বেসরকারি সংস্থা। যেহেতু সরকার অর্থ প্রদান করবে সে কারণে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকেই যাবে।

২০.০ বিশ্বব্যাংক মিশনের সাথে অক্টোবর ২৪, ১৯৮৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে wrap-up বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের Aide Memoire-এ কিছু কিছু পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়।

২১.০ ডিসেম্বর ১২, ১৯৮৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ এক পত্রে প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশন সম্পর্কে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতামত আহ্বান করেন। উক্ত পত্রে ৯-সদস্য বিশিষ্ট একটি সদস্য তালিকাও (members designate) প্রদান করা হয়। এতে উল্লেখ থাকে যে শুধুমাত্র মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব আনিসুজ্জামান খান ব্যতীত সকলেই ব্যক্তিগতভাবে ফাউন্ডেশনের সদস্য হবেন। আনিসুজ্জামান খান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৮৬ সাল

২২.০ মার্চ ১, ১৯৮৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের খসড়া স্মারক ও সংঘ বিধি (Memorandam and Articles of Association) সম্বন্ধে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ আইন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে আইনগত বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে একটি 'policy paper' প্রস্তুত করে পরবর্তী আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে উপস্থাপন করবেন, যা চূড়ান্ত হবার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপন করা হবে। যেহেতু সরকারি অর্থ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হবে, সে কারণে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

২৩.০ বিশ্বব্যাংকের সদর দফতরে বাংলাদেশ ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান Frederic T. Temple নভেম্বর ১৩, ১৯৮৬ তারিখে ইআরডি সচিবকে প্রস্তাবিত Rural Non-Farm Employment and Training Project সম্বন্ধে এক পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে প্রকল্পের জন্যে সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশে আগত আইডিএ মিশনের Aide-Memoire এ উল্লিখিত পরামর্শসমূহ নিশ্চিত করে UERC স্থাপনের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়। বর্ণিত Aide-Memoire-এর ওপর সরকারের মতামত আহবান করার পাশাপাশি বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াসে বিশ্বব্যাংকের অধিকতর চিন্তাভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়। আইডিএ প্রস্তাবিত UERC প্রকল্পের জন্যে অর্থ প্রদানের পাশাপাশি গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে এর উপকারভোগীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করার জন্যেও অর্থ প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, যদি গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে অর্থের প্রয়োজন না হয় তবে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্ম-এলাকার বাইরে একটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে আইডিএ অর্থ প্রদান

করতে সম্মত আছে বলে জানানো হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৮৭ সাল

২৪.০ ইআরডি ফেব্রুয়ারি ৮, ১৯৮৭ তারিখে বিশ্বব্যাংকের উপরোক্ত ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন-এর মতামত আহ্বান করে। অর্থ মন্ত্রণালয় মার্চ ৮, ১৯৮৭ তারিখে গ্রামীণ ব্যাংকের মতামত চায়। ইতোমধ্যে মার্চ ২, ১৯৮৭ তারিখে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস থেকে ইআরডি সচিব বরাবর গ্রামীণ ব্যাংক-কে সহায়তা করার প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনরায় পত্র দিয়ে এ বিষয়ে তাদের নভেম্বর ১৩, ১৯৮৬ তারিখের পত্রের জবাব প্রত্যাশা করা হয়। শেষোক্ত পত্রে বলা হয় যে, গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যে বিশ্বব্যাংক অত্যন্ত চমৎকৃত এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থ গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবহৃত হলে অর্থ ব্যবহারের গুণাগুণ রক্ষিত হবে বলে বিশ্বব্যাংক বিশ্বাস করে। ইআরডি-কে অনুরোধ জানানো হয় যেন বিশ্বব্যাংক, অন্যান্য সম্ভাব্য দাতাসংস্থা এবং গ্রামীণ ব্যাংকের উপস্থিতিতে একটি অনানুষ্ঠানিক সভা আহবান করে, যেখানে গ্রামীণ ব্যাংক তার অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২৫.০ অনুচ্ছেদ ১৮ ও ১৯ এ উল্লিখিত প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আইডিএ Upazila Resources Development and Employment Project (URDEP) নামে আরেকটি প্রকল্পের ধারণা অবতারণা করে যেখানে NGO-দেরকে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিজস্ব উদ্যোগে URDEP নামেই আরেকটি প্রকল্প তখন যথারীতি প্রস্তুত করেছে। URDEP এর ওপর আইডিএ মিশন-এর সাথে পরিকল্পনা কমিশনে সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে ফেব্রুয়ারি ১২, ১৯৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যুব মন্ত্রণালয় এবং আইডিএ মিশন-এর সাথে ব্যাপক মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়।

২৬.০ গ্রামীণ ব্যাংক মার্চ ৩০, ১৯৮৭ তারিখে অর্থ সচিব বরাবর লিখিত এক পত্রে জানায় যে, ১৯৯৫ সালের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ১৭০০টি শাখা স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং এর জন্যে অর্থ সংস্থান করা কোন সমস্যা হবে না। মার্চ ২৯, ১৯৮৭ তারিখে গ্রামীণ ব্যাংক ইআরডি সচিব বরাবর লিখিত অন্য এক পত্রে উল্লেখ করে যে বিশ্বব্যাংকের মার্চ ২, ১৯৮৭ তারিখের পত্র তারা পেয়েছে এবং গ্রামীণ ব্যাংক সম্প্রসারণের ব্যাপারে অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন হলে তারা সরাসরি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যথাসময়ে যোগাযোগ করবে। বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত বৈঠকেরও কোন প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করে না।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৮৮ সাল

২৭.০ জানুয়ারি ২৩, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস-মার্শাল এ.কে. খন্দকারের সভাপতিত্বে UERC এবং URDEP সম্পর্কে গঠিত কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উল্লেখ করা হয় যে, ইতঃপূর্বে আইডিএ UERC স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু TAPP এবং PP তৈরির পর ১৯৮৬ সালে আইডিএ-এর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হওয়াতে সরকারি অর্থে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্যে যুব মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেয়া হয়। যুব মন্ত্রণালয় URDEP নামে প্রকল্পটি দুইটি উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে পুনরায় আইডিএ UREC/URDEP প্রকল্পের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

২৮.০ ইতোমধ্যে UERC প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে বিশ্বব্যাংক ফাউন্ডেশন গঠনের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্যে চাপ দিতে থাকে। বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্যে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি একটি কমিটি গঠন করে দেন। প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এ কমিটির সদস্য করা হয়।

২৯.০ (ক) কমিটির প্রথম বৈঠকে বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশন অগ্রহণযোগ্য বলে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস মত প্রকাশ করেন এবং সরকারের নিজস্ব অর্থে ভিন্নধর্মী ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাব দেন। কমিটি এ ফাউন্ডেশনের রূপরেখা রচনার জন্যে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে দায়িত্ব প্রদান করে।

(খ) প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন একটি ফাউন্ডেশনের রূপরেখা প্রস্তুত করে দেন এবং এর নাম দেন "ক্ষুদ্রঋণ ফাউন্ডেশন"।

(গ) ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৯৮৮ তারিখে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের রূপরেখা বিবেচনার জন্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত কমিটির সভা আহবান করা হয়। কমিটির সভাপতি পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং প্রথম পাঁচ বছর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পদে এটা পরিচালনার জন্যে একমত পোষণ করা হয়।

৩০.০ (ক) "Poverty Alleviation and Rural Employment Project" এর ওপর আইডিএ-এর একটি প্রাক-মূল্যায়ন মিশন Om P. Nijhawan-এর নেতৃত্বে মার্চ ১৫ থেকে এপ্রিল ৫, ১৯৮৮ তারিখে বাংলাদেশ পরিদর্শন করে। মিশন এপ্রিল ২, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের নিকট Aide-Memoire জমা দেয়। Aide-Memoire-এ আইডিএ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক প্রস্তাবিত 'ক্ষুদ্রঋণ ফাউন্ডেশন'-এর ধারণা গ্রহণ করে। সরকার দ্রুত আনুষ্ঠানিকভাবে ফাউন্ডেশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিলে আইডিএ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত মতামত সংকলিত করে আইডিএ ও সরকারের মধ্যে সমঝোতার প্রস্তাব দেয়।

(খ) একই Aide-Memoire-এ আইডিএ UERC স্থাপনের কথা বলে এবং প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে UERC গুলোকে অর্থায়ন করা যাবে বলে মত প্রকাশ করে। সাথে সাথে BRAC Bank প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে এবং URDEP-এর সম্প্রসারণেরও সুপারিশ করে। এছাড়া বেসরকারি সংস্থার ভূমিকার ব্যাপারে সরকারের নীতি ঘোষণার সুপারিশ করে।

৩১.০ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে আইডিএ-এর মিশন-এর সাথে এপ্রিল ৪, ১৯৮৮ তারিখে "Poverty Alleviation and Rural Employment Project" এর Aide Memoire (এপ্রিল ২, ১৯৮৮)-এর ওপর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে, সরকার যথাসময়ে "ক্ষুদ্রঋণ ফাউন্ডেশন" এর বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে। সরকার UERC স্থাপনের ব্যাপারে পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে জানানো হয়। BRAC প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশন হতে অর্থ নিতে পারবে। সেজন্যে বর্তমান পর্যায়ে পৃথকভাবে BRAC Bank প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। আইডিএ সরকারের নিকট হতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক উত্তর চায়।

৩২.০ ইতোমধ্যে এপ্রিল ৭, ১৯৮৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় UERC এবং URDEP সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদিত হয় এবং এর ভিত্তিতে আইডিএ-এর সাথে আলোচনা করতে বলা হয়।

৩৩.০ ১৯৮০'র দশকের শেষে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দ্বিবার্ষিক ভিত্তিতে বাংলাদেশে আইডিএ-এর সাহায্য পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের জন্যে বিশ্বব্যাংকের পরিচালক Shinji Asanuma, Asia Region Country Program Department-ও-এর বাংলাদেশ সফর (মে ২৯-জুন ৬, ১৯৮৮) আয়োজন করা হয়। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস মে ২১, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানকে Asanuma-এর আলোচ্যসূচি প্রেরণ করে। আলোচ্যসূচিতে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার জন্যে বিস্তারিত পদক্ষেপের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। দারিদ্র্য বিমোচনের প্রস্তাবিত প্রকল্পে মোট ১০০ মিলিয়ন ডলার-এর সম্ভাব্য পরিমাণের কথাও উল্লেখ করা হয়।

৩৪.০ জুন ৪, ১৯৮৮ তারিখে Shinji Asanuma পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। সভায় দীর্ঘদিন থেকে প্রস্তাবিত (Employment Opportunities for the Rural Poor- A Feasibility Report, ১৯৮৫ থেকে প্রকল্পটির উৎপত্তি) "Poverty Alleviation and Rural Employment Project"-এর ওপর আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে। আলোচনাকালে Asanuma এপ্রিল ২, ১৯৮৮ তারিখের Aide Memoire-এর ওপর সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিক উত্তর প্রদানের অনুরোধ করেন। কাজী ফজলুর রহমান কয়েক দিনের মধ্যেই সরকারের আনুষ্ঠানিক উত্তর প্রদানের আশ্বাস দেন।

৩৫.০ (ক) জুন ২৬, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী এ.কে. খন্দকারের সভাপতিত্বে দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প সম্পর্কে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, সভায় বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ ফাউন্ডেশন স্থাপন সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে "এইরূপ নামকরণে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যপরিধি সীমিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইতে পারে।" বিকল্প হিসেবে "পল্লী কর্মসংস্থান ফাউন্ডেশন বা অনুরূপ কোন নামকরণের কথা যথাসময়ে বিবেচনা করা যাইবে" বলেও অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

(খ) সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ-এর তত্ত্বাবধানে আইনগত, আর্থিক ও সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যপদ্ধতি, জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদিসহ গ্রামীণ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ফাউন্ডেশনের একটি রূপরেখা এক মাসের মধ্যে প্রস্তুত করা হবে। পরবর্তীকালে তা' পরিকল্পনা মন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় বিবেচিত হবে।

৩৬.০ জুলাই ১৩, ১৯৮৮ তারিখে বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের কাঠামোতে অনেকগুলো পরিবর্তন প্রস্তাব করে:

(ক) ফাউন্ডেশন 'লাভের জন্যে নয়' প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজ উন্নয়ন বিভাগে রেজিস্ট্রিকৃত হবার সাথে সাথে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়ন পাবার জন্যে ইআরডি-এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে;

(খ) ফাউন্ডেশনকে একটি Public Limited Company হিসেবে গঠন করে এর ন্যূনতম Capitalization নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত থাকবে: GOB শতকরা ২০ ভাগ, NGO শতকরা ৩০ ভাগ, দাতা সংস্থাসমূহ শতকরা ৫০ ভাগ; এবং

(গ) ফাউন্ডেশনের বোর্ডে প্রত্যেক দাতা সংস্থার প্রতিনিধি থাকবে।

৩৭.০ বিশ্বব্যাংক ফাউন্ডেশনের প্রথম পাঁচ বছরের কার্যকালে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে বলে প্রাক্কলন করে। তন্মধ্যে ৩০ মিলিয়ন ডলারই BRAC Bank-কে অর্থায়ন করার জন্যে হিসেব করা হয়। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে সরকার BRAC Bank প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই বলে আইডিএ-কে জানিয়ে দিয়েছিল।

৩৮.০ ইআরডি জুলাই ১৭, ১৯৮৮ তারিখে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ মিশনকে জানায় যে, আইডিএ মিশনের সাথে এপ্রিল ৪, ১৯৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত মতামতই Aide Memoire-এর ওপর সরকারের আনুষ্ঠানিক মতামত হিসাবে গৃহীত হবে। কার্যবিবরণীর কোন বিষয়ে প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক অধিকতর ব্যাখ্যা চাইতে পারে।

৩৯.০ সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী এ.কে. খন্দকারের সভাপতিত্বে "পল্লী কর্মসংস্থান ফাউন্ডেশন" স্থাপন এবং এ সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ফাউন্ডেশনের কাঠামোতে বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবসমূহের (অনুচ্ছেদ-৩৬) বিরোধিতা করে বলেন যে, যেহেতু ফাউন্ডেশন সরকারের নিজস্ব সম্পদে স্থাপিত ও পরিচালিত হবে সেক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের বোর্ডে দাতাসংস্থার প্রতিনিধি থাকার কোন প্রয়োজন নাই। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ফাউন্ডেশনের বোর্ডে কোন দাতাসংস্থা/দেশ হতে প্রতিনিধি থাকবে না। ফাউন্ডেশনের জন্যে একটি ভালো নাম আহবান করা হয়।

৪০.০ বিশ্বব্যাংকের পরিচালক Shinji Asanuma অক্টোবর ৭, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী এ.কে. খন্দকারকে লিখিত পত্রে "Poverty Alleviation and Rural Employment Project"-এর আওতায় ৮০ মিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু শর্ত হিসেবে উক্ত প্রকল্পের নিম্নোক্ত চারটি অংশকেই গ্রহণ করতে বলেন: (ক) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা এবং BRAC Bank-কে অর্থায়ন করা, (খ) NGO নীতি ঘোষণা করা, (গ) Cooperative System ও BRDB-কে শক্তিশালী করা এবং (ঘ) Employment Monitoring Unit (EMU) চালু করা। ইতঃপূর্বে সরকার BRAC Bank প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই বলে জানায় এবং Cooperative System/BRDB reform এবং EMU চালু করার বিষয়টি প্রস্তাবিত প্রকল্প হতে "delink" করতে বলে। উপরোক্ত বিষয়ে আইডিএ এবং সরকারের মধ্যে সমঝোতা হলে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ মাসে প্রকল্প মূল্যায়ন মিশন বাংলাদেশ সফর করবে বলে জানানো হয়।

৪১.০ নভেম্বর ১৬, ১৯৮৮ তারিখে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ মিশনের প্রধান ইআরডি-এর অতিরিক্ত সচিব কাজী শামসুল আলমকে লিখিত পত্রে জানান যে, পরিকল্পনা মন্ত্রী এ.কে. খন্দকার Shinji Asanuma-র বাংলাদেশ সফরের সময় অনুচ্ছেদ ৪০-এ উল্লিখিত প্রকল্পের চারটি অংশই গ্রহণ করেছেন। এই প্রেক্ষিতে জানুয়ারি ১৯৮৯ সময়ে প্রাক-মূল্যায়ন মিশন বাংলাদেশ সফর করবে বলে জানানো হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের উপরোক্ত চারটি অংশের বিষয়ে বিশ্বব্যাংক জুলাই ১৪, ১৯৮৮ তারিখে ইআরডি-কে এক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করেছিল।

৪২.০ ডিসেম্বর ৩, ১৯৮৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শেখ মকসুদ আলী ইআরডি-এর নভেম্বর ১৭, ১৯৮৮ তারিখে লিখিত পত্রের জবাবে আনুষ্ঠানিক এক পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন যুক্তি সহকারে ফাউন্ডেশন গঠন করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন।

৪৩.০ Shinji Asanuma ডিসেম্বর ৯, ১৯৮৮ তারিখে লিখিত এক পত্রে ইআরডি-এর সচিব ইনাম আহমেদ চৌধুরীকে "Poverty Alleviation and Rural Employment Project"-এর চারটি অংশ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বব্যাংককে জানানোর জন্যে অনুরোধ করেন। পত্রে

দাবী করা হয় যে, পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং ইআরডি সচিব Asanuma-এর বাংলাদেশ সফরের সময় চারটি অংশ নিয়েই প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণে রাজী হন।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৮৯ সাল

৪৪.০ জানুয়ারি ১১, ১৯৮৯ তারিখে ইআরডি প্রকল্পের চারি অংশের ব্যাপারে ব্যাখ্যাসহ বিশ্বব্যাংকের স্থানীয় অফিসকে আনুষ্ঠানিক পত্র পাঠায়। পত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে BRAC Bank প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে BRACI যোগ্যতার ভিত্তিতে ফাউন্ডেশন হতে ঋণ নিতে পারবে বলে জানানো হয়।

৪৫.০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সময়ে আইডিএ-এর একটি প্রাক-মূল্যায়ন মিশন ঢাকা সফর করে। মিশন-এর Aide Memoire-এ প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের দুই ধরনের তহবিল থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়: (ক) ঋণ তহবিল এবং (খ) সামাজিক উন্নয়ন তহবিল। প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনটি পরিপূর্ণভাবে মূল্যায়নের পূর্বে নিম্নলিখিত চারটি বিষয় সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়: (১) ফাউন্ডেশন আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, (২) ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করা ও তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করা, (৩) সরকার কর্তৃক ফাউন্ডেশনকে ৫ কোটি টাকা প্রদান করা, এবং (৪) ফাউন্ডেশনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে উপযুক্ত জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করা। Aide Memoire-এ আরও উল্লেখ করা হয় যে, ফাউন্ডেশনের জন্যে আইডিএ-এর অর্থবছর ১৯৯০-এ অর্থবরাদ্দ রাখা সম্ভব হবে না।

৪৬.০ ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৮৯ তারিখে আইডিএ মিশন-এর সাথে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে wrap-up সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, সরকার ফাউন্ডেশন গঠনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে এবং আইডিএ মিশন প্রস্তাবিত প্রকল্প যাতে আইডিএ-এর বোর্ডে তাদের অর্থ-বৎসর ১৯৯০-তেই উপস্থাপিত হয় সে চেষ্টা করবে।

৪৭.০ অন্যদিকে জানুয়ারি ১৭, ১৯৮৯ তারিখেই ফাউন্ডেশন গঠনের বিষয়টি নীতিগত অনুমোদনের জন্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে রাষ্ট্রপতির নিকট সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। ফাউন্ডেশনের নাম প্রস্তাব করা হয় "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন"। সার-সংক্ষেপে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনকে ১০ কোটি টাকা প্রদান করার এবং ফাউন্ডেশন কার্যক্রম আরম্ভ করার প্রথম দুই বছর কোন ঋণ গ্রহণ করবে না বলে সুপারিশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি মার্চ ৭, ১৯৮৯ তারিখে ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দান করেন এবং প্রস্তাবটির বিশদ বিবরণসহ মন্ত্রিপরিষদের সভায় পেশ করার নির্দেশ দেন।

৪৮.০ বিশ্বব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ সফর করবেন এবং এ উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মুখ্য আলোচ্য বিষয় হবে বলে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমান তার নিজস্ব বিভাগকে এক লিখিত নোটে পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্যে সার-সংক্ষেপ তৈরি করতে নির্দেশ প্রদান করেন।

৪৯.০ মার্চ ২১, ১৯৮৯ তারিখে বিশ্বব্যাংকের Martin Karcher, Chief, Population and Human Resource Devision, Asia Region, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানকে লিখিত পত্রে আইডিএ-এর ফেব্রুয়ারি ৯-২৭, ১৯৮৯ তারিখের প্রাক মূল্যায়ন মিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত Aide Memoire এর অবস্থানকে সমর্থন করেন। অনুচ্ছেদ-৪০ এ উল্লিখিত চারটি শর্ত পূরণ করা হলে আইডিএ প্রকল্প মূল্যায়ন মিশন প্রেরণ করবে বলে জানানো হয়।

৫০.০ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এপ্রিল ১২, ১৯৮৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির নিকট "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি সংশোধিত সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করে। রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত পূর্বের সার-সংক্ষেপে (অনুচ্ছেদ-৪৭) ফাউন্ডেশন তার কার্যক্রমের প্রথম দু'বছর বাইরের কোন সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করবে না বলে প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সংশোধিত প্রস্তাবে সুপারিশ করা হয় যে, ফাউন্ডেশন কার্যক্রম শুরুর প্রথম থেকেই সীমিত আকারে আইডিএ বা অন্য কোন বহিঃসংস্থা থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে। আরও উল্লেখ করা হয় যে, আইডিএ ও অন্যান্য সংস্থা ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ যোগানের প্রস্তাব করেছে। এই অর্থ পেতে হলে দ্রুত ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এর জন্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যূনপক্ষে যুগ্ম-সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন একটি (Officer-on-Special-Duty- OSD) পদ সৃষ্টি করতে হবে। এ পদে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা পরে ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

৫১.০ রাষ্ট্রপতির পূর্বের নির্দেশ মোতাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন" স্থাপনের জন্যে এপ্রিল ১২, ১৯৮৯ তারিখে প্রস্তুতকৃত সার-সংক্ষেপটি আলোচনার নিমিত্ত ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে প্রেরণ করে।

৫২.০ মে ১০, ১৯৮৯ তারিখের এক পত্রে বিশ্বব্যাংকের Martin Karcher পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানকে জানান যে "Poverty Alleviation and Rural Employment Project"-এর জন্যে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব আইডিএ-এর অর্থ বৎসর ১৯৯০-এর বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হলে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ এর মধ্যে এ প্রকল্পের মূল্যায়ন শেষ করতে হবে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকারও চায় প্রকল্পটি আইডিএ-এর অর্থবৎসর ১৯৯০-এ বোর্ড সভায় উপস্থাপিত হোক, সে জন্যে মূল্যায়ন মিশন প্রেরণের পূর্বশর্ত হিসাবে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত চারটি শর্ত পূরণ করতে হবে: (ক) আইনগতভাবে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা, (খ) প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করা, (গ) গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দান, এবং (ঘ) সরকার কর্তৃক ফাউন্ডেশনকে ৫ কোটি টাকা প্রদান করা।

৫৩.০ ইআরডি উপরোক্ত শর্তগুলি (অনুচ্ছেদ-৫২) পূরণের সর্বশেষ অগ্রগতির ব্যাপারে মে ২৪, ১৯৮৯ তারিখের পত্রে পরিকল্পনা কমিশনের নিকট অগ্রগতি জানতে চায়। মে ২৮, ১৯৮৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন ইআরডি-কে জানায় যে, "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনাধীন রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ইআরডি-কে যথাসময়ে জানানো হবে।

৫৪.০ ইতোমধ্যে আইডিএ প্রস্তাবিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প, গ্রামীণ ব্যাংক-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য একটি প্রকল্প স্থাপন, ব্র্যাক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, আইডিএ ও সরকারের আলোচনা, প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক বিচিত্রা মে ১৯, ১৯৮৯ তারিখে "গ্রামীণ ব্যাংক বনাম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক" শীর্ষক এক প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশ করে।

৫৫.০ মে ২৫, ১৯৮৯ তারিখে বিশ্বব্যাংক ঢাকায় অবস্থিত World Food Programme eivei GK পত্রে World Food Program কর্তৃক পরিচালিত VGD Programme-এর উপকারভোগীদের প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পৃক্ত করার সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্যে একটি সমীক্ষা করার কথা বলে, যার জন্যে আইডিএ WFP-কে তিন হাজার মার্কিন ডলার প্রদানেরও প্রস্তাব দেয়। পত্রে উল্লেখ রয়েছে, যে-সকল বেসরকারি সংস্থা VGD-এর উপকারভোগীদের সংগঠিত করবে

তারা ফাউন্ডেশন হতে ঋণ পাবে এবং ফাউন্ডেশনের সামাজিক উন্নয়ন তহবিল (ঝড়পরধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ঋঁহফ) থেকে অনুদান পাবে।

৫৬.০ জুন ১, ১৯৮৯ তারিখে ঢাকাস্থ ডেনিস দূতাবাসের কাউন্সেলর" "Like Minded Group" (CIDA, NORAD, SIDA, DANIDA Ges HOLLAND) এর পক্ষ থেকে পরিকল্পনা কমিশনকে জানায় যে, পরবর্তী Paris "Aid Consortium Meeting"-এ "Poverty Alleviation Policies in Bangladesh" নামে একটি চড়ংরঃরড়হ চধঢ়বৎ উপস্থাপন করা হবে। সংস্থাটি মনে করে যে, নিকট অতীতে সরকারের সহযোগিতায় তারা সমাজের হতদরিদ্রদের জন্যে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা সম্পাদন করেছে এবং বাংলাদেশে তাদের সকল সহযোগিতা হতদরিদ্রদের জন্যেই পরিচালিত হচ্ছে।

৫৭.০ রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের জুন ১১, ১৯৮৯ তারিখের বৈঠকে প্রস্তাবিত "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন" গঠনের প্রস্তাবটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদানের জন্যে উপ-প্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম.এ. মতিনের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

৫৮.০ জুলাই ১২, ১৯৮৯ তারিখে বিশ্বব্যাংকের এশীয় অঞ্চলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট Attila Karaosmanoglu রাষ্ট্রপতি এইচ.এম. এরশাদকে পত্র লেখেন। পত্রে ফাউন্ডেশন স্থাপনের বিষয়ে ধীরগতির জন্যে অভিযোগ করা হয় এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল্যায়ন সেপ্টেম্বর ১৯৮৯-এর মধ্যে সম্পন্ন না করা গেলে আইডিএ ঋণ কর্মসূচি (Lending Programme) হতে এ প্রকল্প বাদ দিতে হবে বলে পত্রে উল্লেখ করা হয়। ফাউন্ডেশন দ্রুত স্থাপিত না হলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দাতাদেশ/সংস্থার উপরও পড়বে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করে পত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ সরকার যদি আইডিএ-এর অর্থ দ্রুত ব্যবহার করতে না পারে তাহলে Paris Aid Group Meeting-এ আইডিএ-এর প্রতিশ্রুত অর্থও হ্রাস করা হবে।

৫৯.০ পরিকল্পনা বিভাগ জুলাই ২০, ১৯৮৯ তারিখে "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন" গঠনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানকে অবহিত করে।

৬০.০ ইতোমধ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এ.কে. খন্দকার ওয়াশিংটন ডিসিতে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় যোগদান করেন। তিনি ফাউন্ডেশন গঠনের ক্ষেত্রে দুইটি বিষয়ে সরকারের উদ্বেগের কথা উত্থাপন করেন: (ক) ফাউন্ডেশন গঠন করা হলে দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত দাতাদেশসমূহের সকল সম্পদ ফাউন্ডেশনকে দেয়া হতে পারে, যার ফলে সরকারের অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পে অর্থের অভাব হতে পারে; এবং (খ) ফাউন্ডেশনকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়া হলে রাষ্ট্রের নীতি বিরোধী কাজে এ অর্থ ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের এ দু'টি উদ্বেগের বিষয়ে বিশ্বব্যাংক-এর পরিচালক Shinji Asanuma অক্টোবর ১৩, ১৯৮৯ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রীকে ব্যাখ্যা প্রদান করে পত্র লেখেন, যার ফ্যাক্স অনুলিপি অক্টোবর ১৯, ১৯৮৯ তারিখে বিশ্বব্যাংকের স্থানীয় অফিস মন্ত্রীকে প্রেরণ করে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, ফাউন্ডেশনকে প্রদত্ত অর্থ হবে অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় আইডিএ অর্থের অতিরিক্ত। এর ফলে অন্যান্য সরকারি উদ্যোগে অর্থ যোগানের সংকট হবে না। তাছাড়া সরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক ফাউন্ডেশন হতে অর্থ গ্রহণেরও কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না।

সরকারের দ্বিতীয় উদ্বেগের বিষয়ে আইডিএ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, যেহেতু ফাউন্ডেশনের প্রধান হবেন একজন সরকারি কর্মকর্তা সেহেতু রাষ্ট্রনীতি বিরোধী কাজে ফাউন্ডেশনের অর্থ ব্যবহৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, ফাউন্ডেশন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে বেসরকারি সংস্থাদের ঋণ দেবে এবং ফাউন্ডেশনের লেনদেন নিয়মিত নিরীক্ষা করা হবে।

৬১.০ আইডিএ-এর সাথে উপরোক্ত মতবিনিময়ের পর পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে একটি সার-সংক্ষেপ পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির নিকট নভেম্বর ১১, ১৯৮৯ তারিখে উত্থাপন করা হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদে ৭ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন (চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ) সরকার কর্তৃক মনোনীত হবে এবং সাধারণ পরিষদের ২৫ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত হবে বলে সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়। সার-সংক্ষেপের শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী অতি সংক্ষেপে তাঁর নিজস্ব মতামতও লিপিবদ্ধ করেন এবং বলেন, "এই প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সরকার মনোনীত সদস্য সংখ্যার একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকায় ফাউন্ডেশন সরকারি ধ্যান ধারণার আওতায় তাহাদের কার্যক্রম চালাইবে।" সার-সংক্ষেপে ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে বরাদ্দকৃত ৪০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন হিসেবে প্রদানেরও সুপারিশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি নভেম্বর ১৩, ১৯৮৯ তারিখে ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

৬২.০ (ক) পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক নভেম্বর ১২, ১৯৮৯ তারিখে রাষ্ট্রপতি বরাবর আরেকটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, "প্রস্তাবিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের সহিত একটি সন্তোষজনক সমঝোতা হইয়াছে বিধায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রতিষ্ঠানটি গঠনের বিষয় সদয় সম্মতি দিয়াছেন"। সার-সংক্ষেপে আরও উল্লেখ করা হয়, "এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির আশু কার্যোদ্যম গ্রহণ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে যে সকল প্রস্তুতিমূলক কাজ অবিলম্বে হাতে নিতে হইবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব সামাধা করিতে হইবে, সেইগুলি নিম্নরূপ ... ..."। প্রস্তুতিমূলক কাজের চারটি তালিকা দেয়া হয়: (১) রাষ্ট্রপতির অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের আইনগত কাঠামো প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে আলোচনাক্রমে সেটি চূড়ান্তকরণ; (২) আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করা; (৩) প্রতিষ্ঠানটির কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে রূপরেখা প্রণয়ন করা; এবং (৪) প্রতিষ্ঠানটির সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করে অনুমোদন গ্রহণ করা।

(খ) "উপরোক্ত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইলে প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধীকরণের পর পরই ইহার পক্ষে সক্রিয় হওয়া সম্ভব হইবে" উল্লেখ করে সার-সংক্ষেপে পরবর্তী উদ্বেগের কথা স্মরণ করে বলা হয় যে, বিশ্বব্যাংক কর্তৃক জানুয়ারি মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে মূল্যায়ন মিশন প্রেরণের জন্যে ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলো অন্যতম পূর্বশর্ত।

(গ) সার-সংক্ষেপে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ফাউন্ডেশনের উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্যে "ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী পরিচালক (Executive Director) এর পদে একজন উপযুক্ত কর্মকর্তার যথাসত্বর নিয়োগ প্রয়োজন। এই নতুন ধরনের সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানের এই দায়িত্ব পালনের জন্যে পরিশ্রমী, উদ্যোগী এবং বিশেষ করিয়া পল্লী উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজে অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা প্রয়োজন"।

(ঘ) সার-সংক্ষেপে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব বদিউর রহমান অথবা ঢাকা বিভাগের

কমিশনার ওয়ালিউল ইসলামকে ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। রাষ্ট্রপতি বদিউর রহমানকে ফাউন্ডেশন আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্যে OSD হিসেবে নিয়োগ দান করেন। নভেম্বর ১৫, ১৯৮৯ তারিখে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় যুগ্ম-সচিব বদিউর রহমানকে OSD হিসেবে নিয়োগের আদেশ প্রদান করে এবং 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন'-এর প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্তে তাঁকে পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত করে।

৬৩.০ ডিসেম্বর ২২, ১৯৮৯ তারিখে ইআরডি সচিব বরাবর প্রেরিত এক পত্রে বিশ্বব্যাংকের Martin Karcher ফাউন্ডেশনকে ঋণ প্রদানের জন্যে মূল্যায়ন মিশন পাঠানোর প্রস্তাব দেন এবং উক্ত মিশন জানুয়ারি ২২, ১৯৯০ তারিখ হতে বাংলাদেশ সফর করবে বলে জানান। অধিকন্তু, ইত্যবসরে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার 'চার্টার' বিশ্বব্যাংকে পাঠাবার অনুরোধ জানানো হয় এবং ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নিয়োগের প্রক্রিয়া এবং আইনগতভাবে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুরু করার সম্ভাব্য তারিখও জানাবার কথা উল্লেখ করা হয়।

৬৪.০ ডিসেম্বর ২৪, ১৯৮৯ তারিখে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা মিশন প্রধান পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানকে প্রস্তাব দেন যে, প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের কাঠামো, জনবল, জনবল নিয়োগের নিয়মাবলী ইত্যাদি বিষয়ে বদিউর রহমানকে নির্দেশনা প্রদানের জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হোক। কমিটির সদস্য পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, আইডিএ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মধ্য হতে গ্রহণ করা যেতে পারে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিকাশ: ১৯৯০ সাল

৬৫.০ বদিউর রহমান অনুচ্ছেদ-৬৪ এ বর্ণিত কমিটি সম্পর্কে জানুয়ারি ১৪, ১৯৯০ তারিখে ইআরডি-এর সচিব বরাবর এক অনানুষ্ঠানিক টোকায় তাঁর মতামতে বলেন যে, এ ধরনের কমিটির প্রয়োজন নাই এবং কাম্যও নয়। এমনকি জানুয়ারি মাসে প্রস্তাবিত আইডিএ মিশন আগমনের প্রয়োজন নাই বলে তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু যেহেতু ইআরডি দু'বার মিশনকে আসার জন্যে লিখেছে, সেজন্যে সীমিত আকারে আইডিএ-এর সহায়তা গ্রহণের জন্যে মিশনকে আহবান জানানো যেতে পারে। ভবিষ্যতে কোন মিশনকে দাওয়াত দেয়ার পূর্বে ফাউন্ডেশনের মতামতের ভিত্তিতে কার্যপরিধি (Terms of Reference-TOR) প্রণয়ন করে দাওয়াত দেয়ার জন্যে তিনি মত প্রদান করেন।

৬৬.০ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক জানুয়ারি ২২, ১৯৯০ তারিখ হতে মূল্যায়ন মিশন আসার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বদিউর রহমান আইডিএ মিশন যেন ফেব্রুয়ারি ১৯৯০-এর শেষ দিকে সফর করে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ইআরডি-কে অনুরোধ জানান। তাছাড়া আইডিএ মিশনের জন্যে একটি কার্যপরিধি প্রণয়ন করতেও তিনি অনুরোধ জানান। বিশ্বব্যাংক জানুয়ারি ১০, ১৯৯০ তারিখে প্রস্তাবিত মূল্যায়ন মিশন-এ অন্তর্ভুক্ত প্রতিনিধিদের তালিকা এবং প্রত্যেক প্রতিনিধির কার্যপরিধি প্রেরণ করে।

৬৭.০ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদে সরকার কর্তৃক মনোনীত চার জন সদস্যের মনোনয়ন প্রসঙ্গে জানুয়ারি ১৫, ১৯৯০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক স্বয়ং স্বাক্ষরিত এক সার-সংক্ষেপ রাষ্ট্রপতি বরাবর উপস্থাপন করা হয়। সার-সংক্ষেপের প্রস্তাব মোতাবেক একই তারিখে রাষ্ট্রপতি প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এম, সাইদুজ্জামানকে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং গ্রামীণ তখনো প্রক্রিয়াধীন ছিল) বৈঠক আহবান করা হয়। বৈঠকে যে-সকল বিষয় আলোচনা করা হয়,

সেগুলো সুবিন্যস্ত করে অতি সংক্ষিপ্তভাবে মোট সাতটি পয়েন্ট আকারে ইআরডি সচিব বরাবর এপ্রিল ২৩, ১৯৯০ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (designate) ইআরডি সচিবের এপ্রিল ১১, ১৯৯০ তারিখের পত্রের উত্তর প্রদান করেন। পত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, (ক) বিশিষ্ট একটি কমিটির প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং উক্ত পর্ষদে নির্বাহী পরিচালক (ব্যবস্থাপনা পরিচালক)সহ সরকার কর্তৃক চার জন সদস্য মনোনয়নের বিধানও অনুমোদিত হয়।

৬৮.০ ইতোমধ্যে আইডিএ মিশন ঢাকায় আসে। আইডিএ মিশন বিশ্বব্যাংকের ঢাকাস্থ অফিসে জানুয়ারি ২৫, ১৯৯০ তারিখে ফাউন্ডেশন সম্পর্কে একটি briefing meeting-এর আয়োজন করে। উক্ত সভায় বিভিন্ন দেশি-বিদেশি NGO-দের ৪৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করে।

৬৯.০ আইডিএ মিশন জানুয়ারি ৩০, ১৯৯০ তারিখে প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের কাঠামো, দায়িত্ব, জনবল নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে ইআরডি-এর সাথে আলোচনা করার প্রস্তাব করে। আইডিএ মিশনের প্রধান ফেব্রুয়ারি ১০, ১৯৯০ তারিখে ইআরডি-কে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে, যেমন, আইডিএ ঋণের শর্ত, সহযোগী সংস্থা (Partner Organization) নির্বাচনের পদ্ধতি ও মাপকাঠি (criteria), ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ-এর কাঠামো ও দায়িত্ব, পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মতামত/পরামর্শ/প্রস্তাব দেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আইডিএ-এর ঋণ শতকরা ৩ ভাগ সুদে ফাউন্ডেশনকে প্রদানের প্রস্তাব দেয়া হয়।

৭০.০ আইডিএ মিশনের উপরোক্ত বিভিন্ন প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্যে প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সরকার মনোনীত চার জন সদস্য ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৯০ তারিখে বৈঠক করেন। নথি থেকে দেখা যায় যে, বৈঠকের কার্যবিবরণী এম. সাইদুজ্জামান স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন এবং সেটি টাইপ করা হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, (ক) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফাউন্ডেশনের স্মারক ও সংঘ বিধি প্রস্তুত করা হবে, (খ) ফাউন্ডেশন ধীরে ধীরে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কার্যক্রম গ্রহণ করবে, (গ) আইডিএ মিশন-এর সুপারিশসমূহ ভবিষ্যতে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম গ্রহণের সময় বিবেচনা করা হবে, তবে বর্তমান ফাউন্ডেশনের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ব্যাহত হয় এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না, (ঘ) মিশন ফাউন্ডেশনের পরিচালনা সংক্রান্ত যে-সকল খুঁটিনাটি সুপারিশ করেছে সে সম্পর্কে এখনও কোন অর্থবহ মন্তব্য করার অবকাশ নাই, এবং (ঙ) সরকার প্রাথমিকভাবে যে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে তার ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৭১.০ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক তার কর্ম-পরিচালনা এবং আইডিএ-এর মিশন কর্তৃক বিভিন্ন উল্লিখিত বিষয়ে ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৯০ তারিখের বৈঠকে এম. সাইদুজ্জামান যেসকল মতামত প্রদান করেন সেগুলো বদিউর রহমান কর্তৃক একই তারিখে স্বাক্ষরিত একটি অনানুষ্ঠানিক টোকার মাধ্যমে ইআরডি-এর অতিরিক্ত সচিবকে জানানো হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিস্তারিত ব্যাখ্যা সংবলিত এই অনানুষ্ঠানিক টোকায় সরকার কর্তৃক মনোনীত চারজন সদস্যের মধ্যে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে বন্ধনীর ভেতর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। টোকায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয় যে, ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রম শুরুতে সরকারের সম্পদেই চলা উচিত। এভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন ও নিয়ম-কানুন তৈরির পরই শুধু আইডিএ বা অন্যকোন দাতাসংস্থার সাথে অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে ফাউন্ডেশন অর্থবহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। অন্যথায় আইডিএ-এর তৈরি নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতেই ফাউন্ডেশনকে চলতে হবে; কারণ আইডিএ এ-প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করেছে, অথচ ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী মাত্র

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ও রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের মহাপরিচালক আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীকে ফাউন্ডেশনের সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করেন। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইতঃপূর্বে ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের জন্যে ৭-সদস্য কয়েক সপ্তাহ আগে যোগদান করেছেন। এ পরিস্থিতিতে সরকার ফাউন্ডেশনকে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে তা জানা অত্যন্ত জরুরি এবং সরকারকেও আইডিএ-এর সাথে এপ্রিল ১৯৯০-এর মধ্যে ঋণচুক্তি আলোচনা (Credit Negotiation) শেষ করা কতটা জরুরি তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আইডিএ-এর সাথে আলোচনা বিলম্বিত হলে আর কোনো দাতা সংস্থা থেকে অনুদান পাওয়া যাবে কিনা তা-ও দেখা দরকার।

৭২.০ ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৯০ তারিখে আইডিএ মিশন প্রধান মিশনের Staff Appraisal Report (SAR) ইআরডি-কে প্রেরণ করে সরকারের মতামত জানতে চায়। তাছাড়া মার্চ ১০, ১৯৯০ তারিখের মধ্যে ফাউন্ডেশন-এর নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন করার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্পটি আইডিএ-এর অর্থবৎসর ১৯৯০-এর ঋণ কর্মসূচির মধ্যে গ্রহণ করতে হলে এ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা এপ্রিল ১৯৯০-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়।

৭৩.০ বিশ্বব্যাংকের Martin Karcher ইআরডি সচিবকে লিখিত মার্চ ২, ১৯৯০ তারিখের পত্রে পুনরায় সরকারকে জানান যে, আইডিএ-এর জুন ১৯, ১৯৯০-এর বোর্ড সভায় ফাউন্ডেশনের জন্যে ঋণ প্রস্তাব উত্থাপন করতে হলে মার্চ ১০, ১৯৯০ তারিখের মধ্যে ফাউন্ডেশন-এর খসড়া স্মারক ও সংঘ বিধি এবং SAR-এর ওপর সরকারের মতামত পাঠাতে হবে, মার্চ ১৯৯০ এর মধ্যেই ফাউন্ডেশনকে নিবন্ধন করতে হবে এবং এপ্রিল ১৯৯০ এর মধ্যে ঋণচুক্তি আলোচনা শুরু করতে হবে।

৭৪.০ মার্চ ১৬, ১৯৯০ তারিখে রাষ্ট্রপতি বরাবর পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের অপর তিনজন বেসরকারি সদস্যের মনোনয়নের বিষয়ে পাঁচজনের নাম প্রস্তাব করা হয়। রাষ্ট্রপতি তিনজন সদস্যের মনোনয়ন অনুমোদন করেন এবং তাঁরা হলেন, বেগম তাহরুন্নেসা আব্দুল্লাহ, এ.এ. কোরেশী এবং প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

৭৫.০ বিশ্বব্যাংক মার্চ ২৮, ১৯৯০ তারিখে ইআরডি সচিবকে লিখিত পত্রে মন্তব্য করে যে, প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের খসড়া স্মারক ও সংঘ বিধিটি তাঁরা পেয়েছে এবং তাদের মতে এটি একটি অত্যন্ত সুলিখিত (extremaly well written) দলিল যেটিতে ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি সম্বন্ধে তাদের সাথে যে-সমঝোতা হয়েছে তা' সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে বিশ্বব্যাংক উল্লেখ করে যে, খসড়াটির কেবল একটি বিষয়ে তাদের মতামত রয়েছে। ফাউন্ডেশন যেহেতু স্বাধীনভাবে কাজ করবে সেজন্যে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সরকারি চাকুরে হতে হবে ও প্রেষণে নিয়োজিত থাকবে এমন বাধ্যবাধকতা থাকার প্রয়োজন নেই। স্মারক ও সংঘ বিধিতে ফাউন্ডেশনের পরবর্তী ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগের পরিবর্তে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিয়োগের ধারা সংযোজন করতে বলা হয়।

৭৬.০ মার্চ ৩১, ১৯৯০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইনের ২৬ ধারা অনুসারে "গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত ও লাভের জন্যে নয়" সংঘ রূপে নিবন্ধনের নিমিত্তে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে লাইসেন্স গ্রহণের জন্যে আবেদন করে। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমান কর্তৃক বাণিজ্য সচিব বরাবর লিখিত উপরোক্ত পত্রে ফাউন্ডেশনের স্মারক ও সংঘ বিধি আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত করার জন্যে তাঁর সভাপতিত্বে

এপ্রিল ১১, ১৯৯০ তারিখে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়।

৭৭.০ এপ্রিল ৯ এবং এপ্রিল ২১, ১৯৯০ তারিখ এই দুইদিন এডাব (ADAB) মিলনায়তনে প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম নিয়ে এনজিওদের সাথে মতবিনিময় হয়। সভায় এনজিওদের ৫৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ সভাসমূহে বদিউর রহমান এবং প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। এ বিষয়ে বিগত কয়েক বছর যাবৎ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের উত্তম উপায় নির্ধারণের ব্যাপারে মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেন যে, বিশ্বব্যাংকের ৭০ মিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহণ করে তাদের নিয়ন্ত্রণে ফাউন্ডেশন পরিচালনা করার চাপ এখনও অব্যাহত আছে। বদিউর রহমান প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য সমর্থন করে সভাকে আশ্বস্ত করেন যে, ফাউন্ডেশনের নীতিমালা ও কার্যপরিধি বিদেশী কোন দাতার ইচ্ছানুযায়ী নয়, বরং সরকারের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হবে। প্রস্তাবিত ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি সম্বন্ধে উভয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

৭৮.০ এপ্রিল ১১, ১৯৯০ তারিখে ইআরডি বদিউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (designate)-এর নিকট আইডিএ ঋণচুক্তির শর্তাবলীর ওপর মতামত, ঋণচুক্তি আলোচনার জন্যে ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধির নাম, আইডিএ-এর মূল্যায়ন মিশনের রিপোর্ট এবং আইডিএ-এর মার্চ ২৮, ১৯৯০ তারিখের পত্রের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের মতামত জানতে চায়।

৭৯.০ নথি থেকে দেখা যায় যে, অনুচ্ছেদ-৭৬ এ উল্লিখিত এপ্রিল ১১, ১৯৯০ তারিখের পরিবর্তে এপ্রিল ১২, ১৯৯০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে ফাউন্ডেশনের স্মারক ও সংঘ বিধি চূড়ান্ত করার জন্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কিছু সংশোধনীসহ স্মারক ও সংঘ বিধি চূড়ান্ত করা হয় এবং ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইনের ২৬নং ধারার অধীনে ফাউন্ডেশনকে "Company Limited by Guarantee and Association not for profit" হিসাবে নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত হয়।

৮০.০ এপ্রিল ১৬, ১৯৯০ তারিখে আইডিএ ইআরডি-কে আইডিএ-এর প্রস্তাবিত ৪৫ মিলিয়ন ডলারের আইডিএ ঋণ সম্পর্কে আলোচনার নিমিত্তে সরকারের প্রতিনিধি দল পাঠানোর জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। সাথে সাথে ফাউন্ডেশনের সামাজিক উন্নয়ন তহবিল-এ co-financing-এর ব্যবস্থা করতে CIDA, DANIDA, DGIS, NORAD এবং SIDA-কে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করার জন্যেও সরকারের নিকট প্রস্তাব করে।

৮১.০ ইআরডি এপ্রিল ২১, ১৯৯০ তারিখে আইডিএ-কে জানায় যে এপ্রিল ৩০, ১৯৯০ তারিখে প্রস্তাবিত ঋণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করা সরকারের জন্যে অসুবিধাজনক। কারণ, আইডিএ-এর প্রচলিত হলুদ মলাটের SAR এবং খসড়া ঋণচুক্তি তখনও পাওয়া যায় নাই এবং এ সকল কাগজ-পত্র পাওয়ার পর সেগুলো আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে আলোচিত হতে হবে। এ পরিস্থিতিতে মে ৭, ১৯৯০ তারিখ আলোচনার নতুন তারিখ স্থির করার জন্যে ইআরডি প্রস্তাব করে। এছাড়া উল্লেখ করা হয় যে, প্রাথমিক SAR-এ ফাউন্ডেশন সংক্রান্ত অনেক খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে যেগুলোর সম্বন্ধে এ মুহূর্তে ফাউন্ডেশনের পক্ষে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করা সম্ভব হবে না।

৮২.০ এপ্রিল ২৩, ১৯৯০ তারিখে প্রস্তাবিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের একটি অনানুষ্ঠানিক (আনুষ্ঠানিক নিবন্ধীকরণের প্রস্তাব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রারের দফতরে

প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশনের সরকারি অনুদানের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে নিজস্ব ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা উচিত, (খ) পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের পরই আগামী কয়েক বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, তহবিলের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ ও পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হবে এবং (গ) ফাউন্ডেশনের নিজস্ব সত্তা বজায় রাখার স্বার্থে আইডিএ-এর নিকট হতে ৪৫ মিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তির বিষয়ে আলোচনার ব্যাপারেও উপযুক্ত সময় এখন নয়। এছাড়া ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (designate) ফেব্রুয়ারি ১৩, ১৯৯০ তারিখে ইআরডি-এর অতিরিক্ত সচিব বরাবর প্রেরিত উপ-আনুষ্ঠানিক পত্রের বক্তব্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৮৩.০ এপ্রিল ২৩, ১৯৯০ তারিখে এম. সাইদুজ্জামান তাঁর স্বাক্ষরিত এক নোটে আইডিএ-এর SAR এর ওপর তাঁর বিস্তারিত মন্তব্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক) বদিউর রহমান বরাবর প্রেরণ করেন। এম. সাইদুজ্জামান তাঁর মন্তব্যে নিজস্ব সম্পদে প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশন পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে উল্লেখ করেন। তাছাড়া SAR-এ উল্লিখিত আর্থিক প্রাক্কলন সঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে BRAC এবং URDEP কর্তৃক সম্ভাব্য অর্থের প্রয়োজন সম্পর্কে প্রাক্কলন সঠিক প্রতীয়মান হয় না বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি মন্তব্য করেন যে, কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে (পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ) আগামী ৫-৭ বছরে সরকারি/বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচনে কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হবে তার কোন হিসাব আছে কি? থাকলে, আইডিএ-এর প্রস্তাবিত ৪৫ মিলিয়ন ডলারের প্রাক্কলন যাচাই করা সম্ভব হতো। তাছাড়া ফাউন্ডেশন ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে আইডিএ-এর পরামর্শগুলোর ব্যাপারে এ মুহূর্তে ফাউন্ডেশনের পক্ষে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়।

৮৪.০ এপ্রিল ২৭, ১৯৯০ তারিখে বিশ্বব্যাংক পুনরায় সরকার ও ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ঋণচুক্তি আলোচনার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন ডিসিতে গমনের তারিখ জানতে চায়। এ ছাড়া ইআরডি-এর এপ্রিল ২১, ১৯৯০ তারিখের পত্রের জবাবে বিশ্বব্যাংক জানায় যে, "it is extremely important that we agree on the broad parameters and the policy framework within which the Foundation would operate"। বিশ্বব্যাংক পুনরায় জোর দিয়ে বলে যে, আলোচনার সময়েই ঝঅজ এ উল্লিখিত বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক ফাউন্ডেশন হতে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতার মাপকাঠি (eligibility criteria), নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতের (auditing and reporting requirements) বিষয়ে সমঝোতা হতে হবে। এ সকল বিষয়ে সমঝোতা হলে ফাউন্ডেশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে।

৮৫.০ মে ২, ১৯৯০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের অফিসে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সম্পর্কে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আইডিএ প্রস্তাবিত "দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্প"-এর খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদন, খসড়া ঋণচুক্তি এবং খসড়া প্রকল্প চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে ইআরডি-এর পক্ষ হতে বলা হয় যে, ঋণচুক্তির আলোচনা আগামী মে ৭, ১৯৯০ তারিখে না হলে ১৯৯০ অর্থবছরে আইডিএ-এর বোর্ডে এ প্রকল্প উপস্থাপিত হবে না। ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে ইতঃপূর্বে পরিচালনা পর্ষদের এপ্রিল ২৩, ১৯৯০ তারিখের সিদ্ধান্তসমূহ পুনরায় বৈঠকে জানানো হয় এবং বলা হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামী মে ৭, ১৯৯০ তারিখে আইডিএ-এর সাথে ঋণচুক্তি আলোচনা করা "সমীচীন বা যুক্তিসঙ্গত হইবে না"। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, "আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবানুযায়ী পেশকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ঋণচুক্তি ও প্রকল্পচুক্তির ওপর আলোচনা বর্তমান

পর্যায়ে, ... যুক্তিসঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় হইবে না বিধায়, এ সম্পর্কে আই.ডি.এ-কে অবিলম্বে বহিঃসম্পদ বিভাগ অবহিত করিবে"।

৮৬.০ পিকেএসএফ মে ২, ১৯৯০ তারিখে Registrar of Joint Stock Companies-এর দফ্তর হতে Companies Act, ১৯১৩ এর অধীনে নিবন্ধন লাভ করে অর্থাৎ Certificate of Incorporation পায় (নিবন্ধন নম্বর সিটিও-২৮৬(৫)/৯০) এবং ফাউন্ডেশনের স্মারক ও সংঘ বিধি চূড়ান্ত হয়। স্মারক ও সংঘ বিধির অধীনে মে ২৩, ১৯৯০ তারিখে "গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত ও লাভের জন্যে নহে" সংঘ রূপে একটি কোম্পানী গঠনের জন্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ঠিকানাসহ তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং স্বাক্ষর করেন: এম. সাইদুজ্জামান, বদিউর রহমান, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, তাহরুন্নেসা আব্দুল্লাহ, এ. এ. কোরেশী এবং প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

৮৭.০ মে ৬, ১৯৯০ তারিখে ইআরডি সচিব ইনাম আহমেদ চৌধুরী ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে পত্রের মাধ্যমে জানান যে, "সামগ্রিকভাবে বিষয়টি বিবেচনা করে বহিঃসম্পদ বিভাগ মনে করে যে, আইডিএ প্রস্তাবিত আলোচনায় সরকার ও ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে যোগদান করা বাঞ্ছনীয় ও যুক্তিসঙ্গত হবে। ... ... প্রস্তাবিত আলোচনা বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ভবিষ্যত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ অত্যন্ত সহায়ক হবে"।

৮৮.০ মে ৭, ১৯৯০ তারিখে মে ১১-১৮, ১৯৯০ তারিখে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিতব্য "দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্প"-এর ঋণচুক্তি বিষয়ে আলোচনা বৈঠকে তিন সদস্যের বাংলাদেশ দল গঠিত হয়: (ক) ড. হারুন-উর-রশীদ (দলনেতা), ইআরডি, (খ) বদিউর রহমান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, এবং (গ) ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকোনমিক মিনিস্টার অথবা কাউন্সিলর (ইকোনমিক)। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটন গমন করে আলোচনায় অংশ নেয়।

৮৯.০ মে ১৭, ১৯৯০ তারিখে সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম.এ. মুনিমকে লিখিত পত্রে বিশ্বব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট Attila Karaosmanoglu প্রস্তাবিত প্রকল্পের ঋণচুক্তি বিষয়ে আলোচনার ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এ প্রকল্পের বিষয়ে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ঋণ চুক্তি আলোচনার জন্যে "fully authorized and prepared" দল প্রেরণ করা হয় নাই এবং আইডিএ-এর ঋণ কর্মসূচি হতে এ প্রকল্প বাদ দেয়া হয়েছে। এ অর্থ বাংলাদেশের অন্য কোন প্রকল্পের জন্যেও পাওয়া যাবে না বলে আই.ডি.এ জানিয়ে দেয়।

৯০.০ মে ১১-১৭, ১৯৯০ তারিখে বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের মধ্যে কোন চুক্তি ছাড়াই আলোচনা ভেঙ্গে যায়। আইডিএ তার ঋণ কর্মসূচি থেকে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাদ দেয়। উভয় পক্ষ আলোচনার একটি সম্মত কার্যবিবরণীতেও স্বাক্ষর করতে পারেনি। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ও আইডিএ এই আলোচনায় আলাদা আলাদা কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে। বাংলাদেশ দল কর্তৃক পৃথকভাবে মে ১৮, ১৯৯০ তারিখে যে-কার্যবিবরণী তৈরি হয় সেখানে ইআরডি-এর অতিরিক্ত সচিব/দলনেতা ড. এম. হারুনুর রশীদ, বদিউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, সদস্য এবং ড. আকবর আলী খান, ইকোনমিক মিনিস্টার, বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডিসি, সদস্য স্বাক্ষর করেন।

৯১.০ বিশ্বব্যাংকের আলোচনায় ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি বদিউর রহমান তাঁর পরিচালনা পর্ষদের এপ্রিল ২৩, ১৯৯০ সালের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আলোচনা করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল আইডিএ-এর বিভিন্ন দলিলে (SAR, Loan agreement, Project agreement) আরও নমনীয় শর্ত রাখার সুপারিশ করে। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিগণ standard IDA-guidelines এর বাইরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে আইডিএ-এর প্রকল্প রূপরেখা অত্যন্ত অনমনীয় এবং ফাউন্ডেশনের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক বলে মত পোষণ করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আইডিএ সাহায্য কর্মসূচি হতে বাদ দেয়া হয় এই অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের এবং সরকারের এ প্রকল্প এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যাপারে কোন অঙ্গীকার (commitment) নাই এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল "lacked the mandate to make a meaningful agreement with IDA"। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল এ সকল অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করে বলে যে, দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতি অঙ্গীকার বদ্ধ থাকার কারণেই সরকার তার নিজস্ব উদ্যোগে ও অর্থে একটি স্বাধীন কাঠামো সংবলিত ফাউন্ডেশন গঠন করেছে।

৯২.০ অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম.এ. মুনিম বিশ্বব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মে ১৭, ১৯৯০ তারিখে লিখিত পত্রের জবাবে জুন ৭, ১৯৯০ তারিখে প্রস্তাবিত আইডিএ প্রকল্প এবং ব্যর্থ আলোচনার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে পত্র দেন। পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, আইডিএ প্রকল্পে চিরাচরিত রূপরেখা (stereotyped design) ও বজ্রআটুনীযুক্ত রূপরেখা (over-design) বজায় থাকা এবং কোন নমনীয়তা (flexibility) না থাকার কারণে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল আলোচনায় একমত হয়নি। আইডিএ কোন প্রকার নমনীয়তার সুযোগ না দিয়েই একতরফাভাবে প্রকল্প বাতিল করেছে।

৯৩.০ অর্থমন্ত্রীর উপরোক্ত পত্রের জবাব বিশ্বব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট জুন ১৫, ১৯৯০ তারিখে প্রদান করেন। পত্রে দাবী করা হয় যে, ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ যেহেতু সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (যা পূর্বে আইডিএ এর জানা ছিল না) যে, আইডিএ-এর নিকট হতে বর্তমান পর্যায়ে অর্থ গ্রহণ করা হবে না এবং ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের একটি NGO Lobbying-এর সাথে যোগাযোগ করে ব্যাংক এ প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর না হওয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, এসব কারণে বিশ্বব্যাংক এ প্রকল্পকে আইডিএ ঋণ কর্মসূচি হতে বাদ দিয়েছে।

৯৪.০ অর্থমন্ত্রী জুলাই ১, ১৯৯০ তারিখে বিশ্বব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র দেন।

(পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ও যাত্রা শুরুর এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।)

ছায়ালিপি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
টেলিফোন ঃ ৯১২৬২৪০, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
E-mail: pksf@pksf-bd.org, Web: www.pksf-bd.org

dhruBo mc 88 188 33

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩, ফ্যাক্স: +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১

ই-মেইল: pksf@pksf.org.bd, ওয়েবসাইট: www.pksf.org.bd